আশ্বিন, ১৩৮৩

আনন্দমেলা

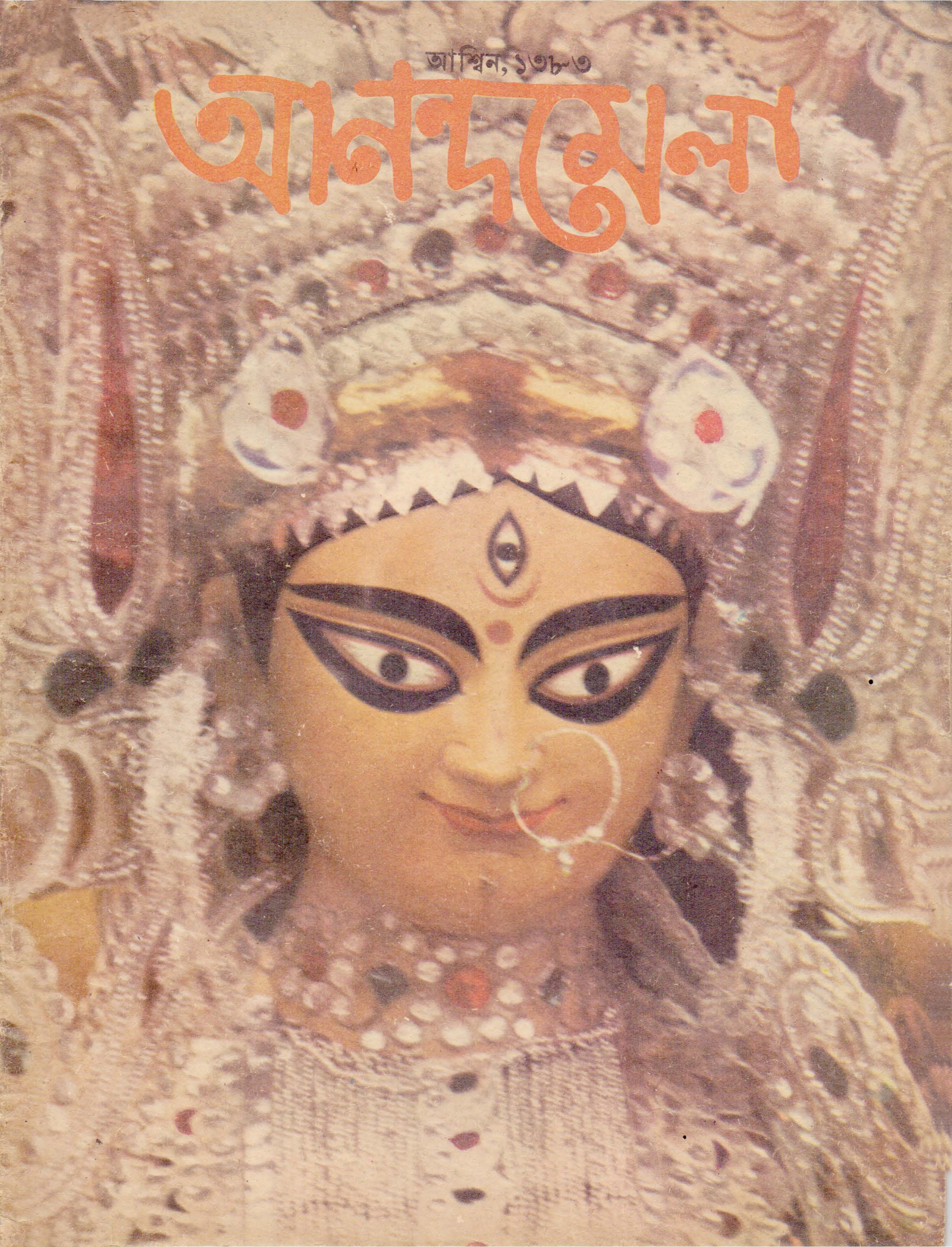

দেবজ্যোতি
ধুলোখেলা
অতীতের সাগর সেঁচে মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

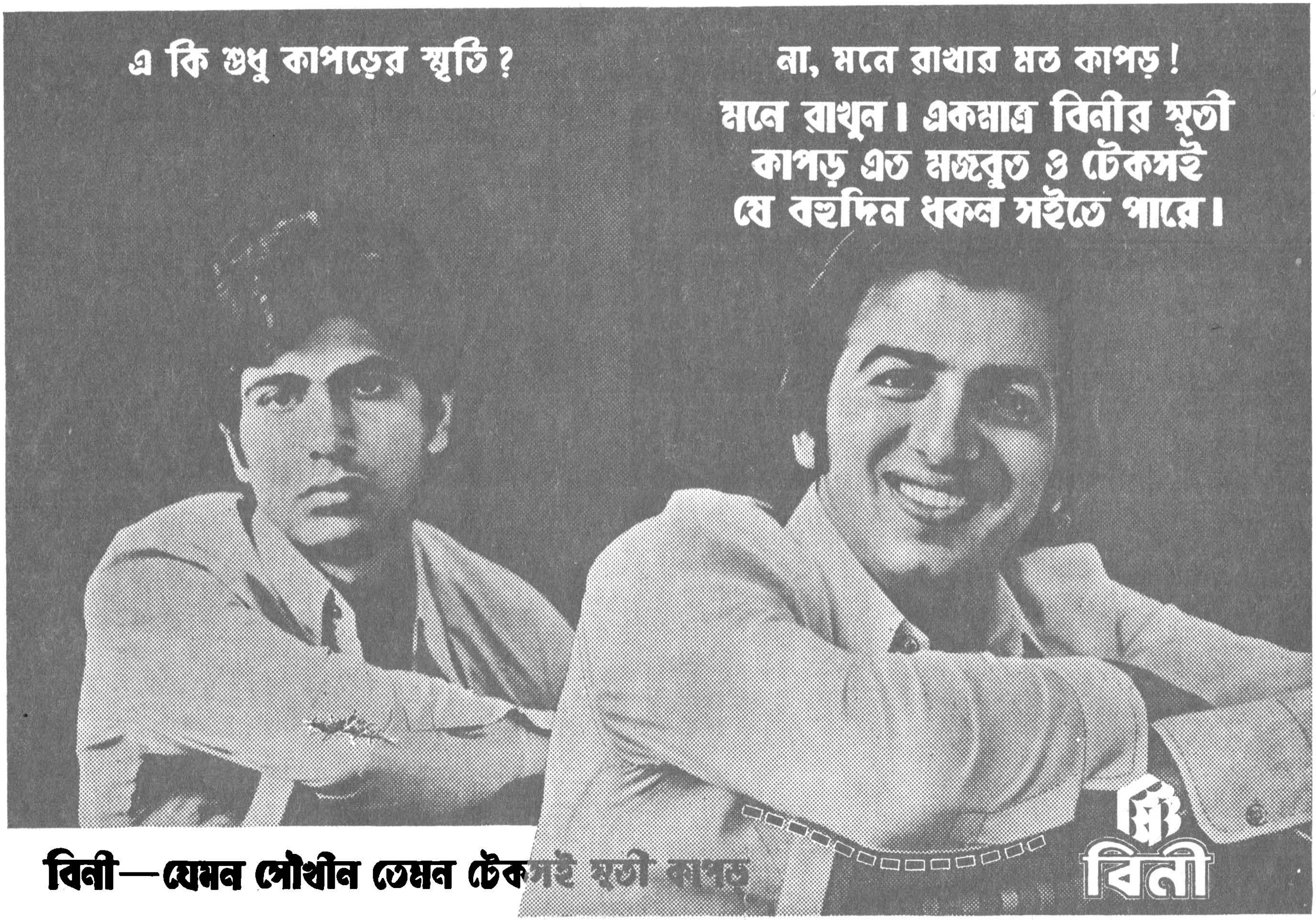
এ কি শুধু কাপড়ের স্মৃতি ?
না, মনে রাখার মত কাপড় !
মনে রাখুন। একমাত্র বিনীর স্মৃতী কাপড় এত মজবুত ও টেকসই যে বহুদিন ধকল সইতে পারে।
বিনী
বিনী—যেমন সৌখীন তেমন টেকসই স্মৃতী কাপড়
BCCM-31 75 BEN

আনন্দমেলা

ছড়া মামলা। প্রেমেন্দ্র মিত্র ৭

গল্প কাজে লাগানো। আশাপূর্ণা দেবী ১০
সবজান্তা। রমানাথ রায় ১৬

বিশেষ রচনা বালিগঞ্জের সিংহ। মিনতি রায় ৫
লালমুখো গ্রহ। সমরজিৎ কর ৫২

উপন্যাস সবুজ দ্বীপের রাজা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩২

লেখাপড়া সুমিত মিত্রের কথা শোনো ৯
নিবেদিতা স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন ৩০
কীভাবে তৈরী হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল ৩১

কমিক্স টারজান ১৪, ১৫, ১৮, ১৯
টিনটিন/বোম্বেটে জাহাজ ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩
ডাইনোসর-চুরি ২৮, গাবলু ৪৭

নতুন বিভাগ শব্দ-সন্ধান ৩৭

আরও ছড়া দুটি ছড়া। বিজয়া মুখোপাধ্যায় ২৬
আরও দুটি। অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭

মহাভারতের গল্প ভীমের অমৃতপান। অমিতা চক্রবর্তী ৪১

বানাও এক বালতি জলে রাজহাঁসটি চলে। পূর্ণেন্দু পত্রী ১৩
আঁকো। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪
শেখো। কারিগর ৪৪

খেলাধুলো জয়, অনেক দিন পরে। স্ট্রাইকার ৪৮
লীগ-জয়ের আগে-পরে। পুষ্পেন সরকার ৫১
খেলায় মজা। দিলীপ দত্ত ২৭

অন্যান্য লেখা মণিমেলার খবর ২৪, ছোটদের ছবি ২৫
ডোডো-তাতাই। তারাপদ রায় ২৫
ধাঁধা আর ধাঁধা ৩৬, আচ্ছা বলো তো ৩৬
ভাবতে পারো ৩৭, আমাদের কলকাতা ৪০
মজার পড়া। কুম্ভক ৪৫, ম্যাজিক ২৬
মাসটা আশ্বিন। দিদিমণি ৪৬
বড়দের কথা। ইন্দ্রমিত্র ৪৬, বিজ্ঞান-বিচিত্রা ৫৪
তোমাদের পাতা ৫৫

দ্বিতীয় বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন ১৩৮৩
সেপটেমবর ১৯৭৬
দেড় টাকা

সম্পাদক
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল :
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

অলংকরণ

এবারকার প্রচ্ছদ চিত্রটি তুলেছেন দেবীপ্রসাদ সিংহ। চারের পাতায় সিংহের ছবি অজয় দত্তগুপ্তের তোলা।

'মামলা', 'আরও দুটি' ও 'মহাভারতের গল্পে'র ছবি এঁকেছেন অসিত পাল; 'কাজে লাগানো' ও 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'র ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র; 'সবজান্তা'র ছবি এঁকেছেন শৈবাল ঘোষ; 'সবুজ দ্বীপের রাজা'র ছবি এঁকেছেন মদন সরকার।

সূচিপত্র

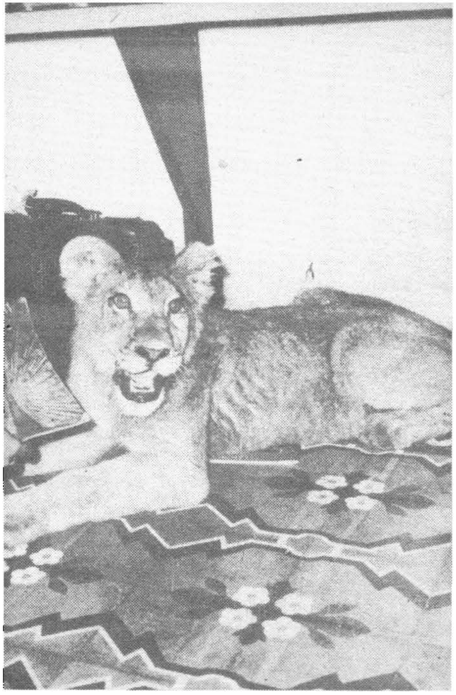

মিনতি রায়

বালিগঞ্জের সিংহ

দুষ্টুমি করে খাটের নীচে লুকিয়ে আছে

'খিদে পেয়েছে। কী এনেছ, দাও।'

বাড়ির দরজায় বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে 'Beware of Dog', মানে, 'কুকুর আছে, সাবধান'। সুতরাং একটু ভয়ে ভয়েই আমরা প্রথমদিন ভিতরে ঢুকেছিলাম, কখন কোন্ দিক থেকে কুকুর লাফিয়ে পড়বে, কুকুরটা বাঁধা আছে না খোলা আছে, কী জানি! কিন্তু না, এ-বাড়িতে এখন আর কোনো কুকুর নেই, আগে ছিল, এখন আছে একটা সিংহ, সে তিনতলার উপরে থাকে। বাড়ির দরজায় এখন তাই লিখে রাখা উচিত : 'সিংহ, সাবধান'। অবশ্য এ রকম একটা নোটিস বাড়ির দরজায় দেখলে অনেকেই হাসবে, বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ভাদ্র সংখ্যা আনন্দমেলা যারা পড়েছে, তারা সবাই জানে, সত্যি এই বাড়িতে সিংহ আছে।

দক্ষিণ কলকাতার পূর্বপ্রান্তে 'ইন্দ্রজাল' নামে এই প্রসিদ্ধ বাড়ি, ট্রেনে কিংবা ট্রামে যারা বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে গিয়েছে তারা সবাই দেখেছে, সবাই জানে বিশ্ববিখ্যাত জাদু-সম্রাট পি সি সরকারের বাড়ি এটা। পি সি সরকারের ছেলে জুনিয়ার পি সি সরকার অর্থাৎ প্রদীপচন্দ্র সরকার দু মাস আগে স্পেন থেকে জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে ফেরার সময় সম্রাট নামে সিংহশাবকটিকে নিয়ে এসেছে সেকথা আগের সংখ্যায় বলেছি।

এই একমাসে সম্রাট আরও অনেক বড়সড় হয়েছে। এখন তার বয়েস পাকা ছয় মাস। গত ফেব্রুয়ারি মাসে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ শহরের এক প্রান্তে এক সার্কাসের তাঁবুতে সম্রাটের জন্ম। ৫

সিংহের হাতে আনন্দমেলা কেন? পড়বে বুঝি?

ফেব্রুয়ারির মাদ্রিদে কনকনে ঠাণ্ডা। সাধারণত সিংহের বাচ্চা জন্মায় ভরা গরমে জুলাই-আগস্টে। জঙ্গলে না-জন্মে তাঁবুতে জন্মেছে বলেই বোধহয় সম্রাটের এই অসময়ে জন্ম।

পৃথিবীর দুই বৃহত্তম সার্কাস দল হল রাশিয়ার 'দি গ্রেট রাশিয়ান সার্কাস', আর আমেরিকার 'রিংলিং' সার্কাস। কিন্তু মূল ইউরোপে এখন এই দুই দলেরই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে স্পেনের 'সিল্কো প্রিথে' সার্কাস। এই সিল্কো প্রিথে সার্কাসেই সম্রাটের বাবা-মা দুজনে খেলা দেখায়। আগুনের মধ্য দিয়ে ঝাঁপ দেয়, দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যায়। এই সার্কাসের মধ্যেই সম্রাটের জন্ম।

আমাদের সঙ্গে সম্রাটকে দেখতে কৃত্তিবাস রায় ওরফে তাতাই এবং সঞ্জীব মিত্র ওরফে ডোডো গিয়েছিল। আমরা যখন জুনিয়র পি সি সরকারের সঙ্গে সম্রাটের ঘরে গেলাম, তখন সে খড়ের বিছানায় আরাম করে বসে ছিল। আমরা ঢুকতেই সে তড়াক করে উঠে বসল। কৃত্তিবাস আরও দু-একবার সম্রাটের কাছে এসেছে, সম্রাট তাকে দেখেই চিনতে পারল, একেবারে তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। কৃত্তিবাস একটু ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসতেই সম্রাটের নজর গেল সঞ্জীবের দিকে, সঞ্জীবের গায়ে একটা নীল রঙের জংলী ছাপা শার্ট। খুব খুশী হয়ে থাবা বাড়িয়ে সম্রাট সেই জামাটা ধরতে গেল, প্রদীপ সরকার বললেন, "ভয় নেই, ভয় নেই, কিছু বলবে না," কিন্তু হাজার হলেও সিংহ,—কৃত্তিবাস-সঞ্জীব এবং আমরা সবাই ভয়ে তিন হাত পিছিয়ে এলাম।

ভয় না-পাওয়ার কথা নয়, একটা বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুরের দ্বিগুণ আয়তন হয়েছে এখন সম্রাটের। বিরাট গোল মাথা, মোটা মোটা থাবা, ঘন গোঁফ। এরই মধ্যে বেশ গর্জন করতে শিখেছে, পাশের ঘর থেকে সম্রাটের হাঁক ডাক শুনলে মনে হয় দূরে কোথাও খুব মেঘ ডাকছে।

আমরা ভয় পেলেও এতক্ষণে সম্রাট কিন্তু এত জনসমাগম দেখে আহ্লাদে ডগোমগো। ঠিক আটখানা না হলেও অন্তত চারখানা হয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে শূন্যে চার পা তুলে লেজ নাচানো শুরু করে দিল সম্রাট। প্রদীপ এগিয়ে যেতে প্রদীপের ডান হাতটা মুখের মধ্যে নিয়ে সে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে জাদুকরকে দুই পা দিয়ে জড়িয়ে ধরল। প্রদীপের স্ত্রী জয়শ্রীর সঙ্গেও সম্রাটের খুব বন্ধুত্ব। প্রদীপ-জয়শ্রী যে-ঘরে থাকে, তার পাশের ঘরেই থাকছে সম্রাট।

আমরা শেষ যেদিন সম্রাটকে দেখতে যাই, সেদিন সারাদিন ধরে নানা ভাবভঙ্গিমায় সম্রাট ও জাদুকরের বহু ছবি তোলা হয়েছে। সম্রাট প্রথমে ক্যামেরা দেখে একটু ঘাবড়িয়ে পিছিয়ে যায়, একবার করে ফ্ল্যাশগান জ্বলে ওঠে, ক্লিক্ শব্দ হয়, আর সম্রাট চমকে ওঠে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সম্রাট ব্যাপারটা বেশ অনুমান করে নিল। আসলে সম্রাট যথেষ্টই স্মার্ট, যে-কোনো অবস্থায় মানিয়ে নিতে সে চমৎকার জানে। একটু মানিয়ে নিয়েই সম্রাটের ঝোঁক পড়ল ঐ ক্যামেরা নামের কালো, চৌকো, কিমাকার দ্রব্যটির উপর যার পাশ থেকে মাঝেমধ্যে আলোর ঝিলিক বেরোচ্ছে। ফটোগ্রাফার অজয়বাবু হিমসিম খেয়ে গেলেন, ক্যামেরাটা রক্ষা করতে।

আমরা নীচে এলাম, কৃত্তিবাসকে বললাম, জাদুকরের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে আনন্দমেলার জন্যে একটা রিপোর্ট লেখো। সেই রিপোর্টটি এই সঙ্গে ছাপা হল। পরের এক সংখ্যা এই আনন্দমেলায়ই জুনিয়ার পি সি সরকার নিজেই হয়তো তাঁর সিংহ পোষার অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি রচনা লিখবেন, 'ঘরে ঘরে সিংহ পুষুন'। তাতে আরও সাংঘাতিক সব ছবি থাকবে।

ছবি তুলেছেন অজয় দত্তগুপ্ত

কৃত্তিবাস রায়ের রিপোর্ট

তারিখ ১ আগস্ট, ১৯৭৬

নাম—শ্রীমান সম্রাট সিংহ

বর্তমান ঠিকানা—ইন্দ্রজাল, কলকাতা-১৯

জন্মস্থান—মাদ্রিদ, স্পেন; আদি নিবাস কেনিয়া, আফ্রিকা।

জন্ম তারিখ, সময়—১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ রবিবার, খুব সকাল বেলায়।

দাম—এর জন্যে জুনিয়ার পি সি সরকারকে কোনো দাম দিতে হয়নি। একটি বিখ্যাত স্প্যানিশ সার্কাস অ্যাসোসিয়েশন উপহার দিয়েছে।

চেহারা—উজ্জ্বল হলুদ রঙ, কানের পেছনটা কালো, পায়ে বড় বড় নখ, ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। ভারী গোঁফ, সুন্দর লোম ও লেজ।

ওজন—৫০ কেজি

লম্বা—৫½ ফুট (লেজ-সমেত)

উচ্চতা—৩ ফুট

গুণাবলী—কথা শুনে কাজ করে। ম্যাজিকের গোপনীয়তা রক্ষা করে। আলো পড়লে সাধারণত জন্তু-জানোয়ারেরা ভয় পায়, কিন্তু ও পায় না।

ব্যবহার—চমৎকার। ছোট ছেলেমেয়েদের দেখলে খুব খুশী হয়। ধমক দিলে, অপমান করলে বোঝে। স্পোর্টস্ম্যান স্পিরিট আছে। খাবার দিলে একসঙ্গে সব খেতে গিয়ে থালা উল্টে দেয়। নিজের খড়ের বিছানা এলোমেলো করে রাখে, কিন্তু নোংরা নয়, চেটেপুটে সবসময় নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

খাবার—দুধ আর মাংস খুব ভালবাসে। আগে কাঁচা মাংস খেত, এখন রান্না করা মাংস খায়, ডাল-ভাতও খায়।

বিবিধ—বেশ আমুদে আর কৌতূহলী স্বভাবের। দুপায়ে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে, ডিগবাজি দিতে, চিৎ হয়ে শুয়ে খেলা করতে ভীষণ ভালবাসে। জমাদারের ঝাঁটা, জামা-কাপড়ের হ্যাঙ্গার, জামাকাপড়, চটি, বই, কাগজ, সুযোগ পেলেই এই সব চিবিয়ে পরীক্ষা করে দেখে। খুব স্মার্ট, কিন্তু সিগারেটের ধোঁয়া দেখলে প্রচণ্ড ভয় পায়।

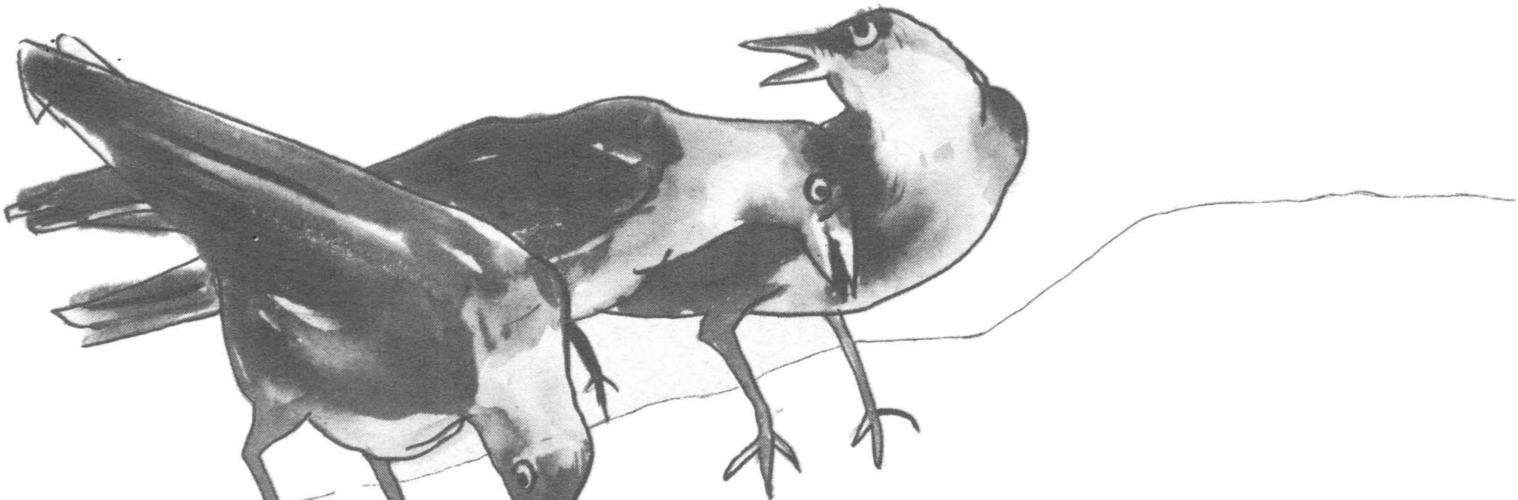

মামলা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ওপারে তিনটে দাঁড়কাক আর
এপারে সাতটা শালিখ
মামলা লড়ছে, —মাঝের নদীর
কারা হক্কের মালিক!

বায়সেরা বলে, "শোন মুখখুরা,
কী বলে জলীয় আইনে,—
নদীটা তাদের,
যারা থাকে তার ডাইনে।"

শালিখেরা বলে, "চুপ!
আইন বুঝিস খুব!
জোয়ার না কি সে ভাঁটার হিসেবে
খবরটা আগে তাই নে!"

দুদলে চেঁচায়, হেনকালে এক
পানকৌটির ছা,
মকদ্দমার ধারও ধারল না।
নদীর গভীরে
আচমকা দিয়ে ডুব,
মাছ নিয়ে যায়। জুলজুল চায়
দুপারে যত বেকুব।

তোমাদের মনের মতো রঙীন পূজাবার্ষিকী

আনন্দমেলা

এবারকার আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ সাড়া পড়ে যাবে। সকলকে একবাক্যে বলতে হবে যে, এমন তাক-লাগানো পূজাবার্ষিকী আর-কখনও বার হয়নি। সূচীপত্রের কিছুটা অগ্রিম আভাস এখনই দিয়ে রাখি :

উপন্যাস থাকছে অনেকগুলি

সত্যজিৎ রায়ের 'শঙ্কুর শনির দশা'
(মনে রেখো, প্রফেসর শঙ্কুর এটি একটি সেরা অ্যাডভেঞ্চার)

শংকরের 'পিকলুর কলকাতা-ভ্রমণ'
(শংকর এবারে বড়দের কিংবা ছোটদের অন্য কোনও পত্রিকাতেই উপন্যাস লিখছেন না)

বিমল করের 'রাজবাড়ির ছোরা'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হলদে-বাড়ির রহস্য'

শৈলেন ঘোষের 'ময়ূরকন্ঠী রঙ'

তা ছাড়া ওয়ালট ডিজনির পুরো একটি 'ছবিতে উপন্যাস'
ডাইনী-পাহাড়ের দিকে

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত একটি নাটক

বড়গল্প ও শিকার-কাহিনী

সুবোধ ঘোষ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, বুদ্ধদেব গুহ

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, মনোজ বসু, জরাসন্ধ, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, শেখর বসু, নবনীতা দেব সেন, অরুণ বাগচী, অজেয় রায়, বলরাম বসাক।

ছড়া

অন্নদাশংকর রায়, অজিত দত্ত, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌমাছি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও আরও অনেকে।

বিশেষ আকর্ষণ

অবনীন্দ্রনাথের ছবি ও ছড়া, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ইয়াসিনের কলকাতা' এবং নিজের খেলোয়াড়-জীবন সম্পর্কে চুনী গোস্বামীর লেখা 'যেমন খেলেছি'।

পরীক্ষার্থীদের জন্য

চারজন হেড এগজামিনারের লেখা 'কী করে নম্বর বাড়াতে হয়'।

আরও অনেক-অনেক লেখা, অনেক-অনেক ধাঁধা, অনেক-অনেক ছবি আর অনেক-অনেক মজা। বাবা-মা, দাদা-দিদি সবাইকে বলে রাখো, যাতে এখন থেকেই তাঁরা এজেন্টকে বলে রাখেন। কিংবা, সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০১, ঠিকানায় লেখ।

দাম ১০.০০। রেজিস্ট্রি ডাকে ১২.১৫।

আনন্দমেলা

AMC-5 BEN

হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষায় ফার্স্ট সুমিত মিত্রের কথা শোনো

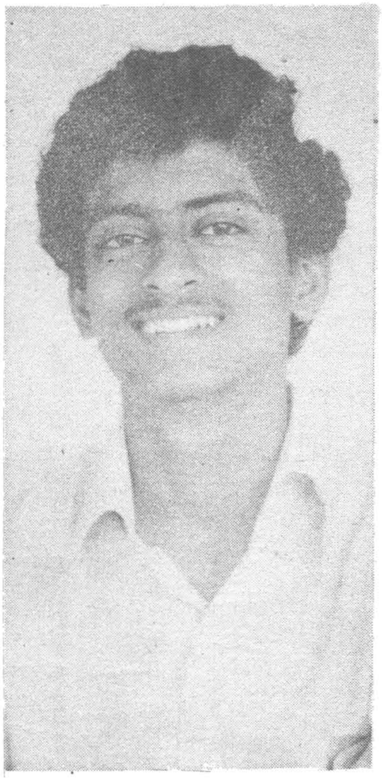

ফিজিক্স্-এ ১৭৪, কেমিসট্রিতে ১৮৪, গণিতে ১৯৩, বাংলায় ১৩৪, ইংরেজীতে ১৩০ আর অ্যাডিশানাল সাবজেক্ট্ মেকানিক্স্-এ পাশমার্ক ছাড়াই ১২৭—এই মার্কশীট কার জানো? এবারকার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশী নমবর পাওয়া ছেলে সুমিত মিত্রের। মোট ৯৪২ নমবর অর্থাৎ শতকরা ৯৪·২ ভাগ নমবরই সুমিত পর্ষতের পরীক্ষকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। হালকা-পাতলা গড়ন, নম্র, শান্ত, সাড়ে-ষোল বছরের ছেলে সুমিত খড়গপুর আই আই টি-তে ভরতি হয়েছে। সেখানে লালা লাজপৎ রায় হল্-এ সুমিতকে আমি প্রশ্ন করলাম, "ফারস্ট্ হবার খবর পেয়ে তুমি চম্কে ওঠোনি? তুমি ওইরকমই আশা করেছিলে?"

সুমিত ঃ এক থেকে পাঁচের মধ্যে হওয়াই আমার লক্ষ্য ছিল। যখন জানলাম আমি ফারস্ট্ হয়েছি, খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। চম্কে উঠিনি. মনে একটা কী-হয় কী-হয় ভাব ছিল, সেটা কেটে গিয়েছিল।

আমি ঃ এক থেকে পাঁচের মধ্যে থাকবার জন্যে তুমি কীভাবে তৈরী হচ্ছিলে?

সুমিত ঃ আমার স্কুলের টীচাররা খুব সাহায্য করেছেন। এক-একটা বিষয়ের ওপর অনেকগুলো করে বই পড়েছিলাম। যে-বইয়ে যেটা ভালো, সেগুলো সব মিলিয়ে দেখে, তুলনা করে আমি নিজের জন্যে নিজেই নোট তৈরী করে নিয়েছিলাম।

আমি ঃ ফিজিক্স্-কেমিসট্রিতে খুব ভালো নমবর তুলতে হলে কীভাবে পড়া উচিত বলে তোমার মনে হয়?

সুমিত ঃ যে-কোনও একটা বই অন্ধের মত ফলো করা উচিত নয়। অনেকগুলো বই কনসাল্ট্ করলে ধারণা পরিষ্কার হয়। ফিজিক্স্-কেমিসট্রিতে খুব পরিষ্কার ধারণা না-থাকলে শুধু পড়ে কিছু লাভ হয় না।

আমি ঃ লেখাপড়ার ব্যাপারে বাড়িতে কারও কাছ থেকে তুমি সাহায্য পাওনি?

সুমিত ঃ মা-বাবার কাছ থেকে খুব সাহায্য পেয়েছি। ক্লাস এইট অব্দি সংস্কৃত ছিল, মা সংস্কৃত আর বাংলা খুব সুন্দর করে পড়াতেন। মা স্কুলের ভালো ছাত্রী ছিলেন। বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আই এ-র পর আর পড়তে পারেননি। বাবার কাছে শিখেছি ইংরেজী।

আমি ঃ ছেলেবেলায় তুমি কোন্ স্কুলে পড়তে?

সুমিত ঃ আমি ক্লাস থ্রি থেকে স্কুলে ভরতি হই, পুরুলিয়ার একটা প্রাইভেট স্কুলে।

আমি ঃ তারপর?

সুমিত ঃ তারপর সিক্স্ থেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে পড়েছি।

আমি ঃ তুমি কি বরাবরই ওখানকার ফার্স্ট বয় ছিলে?

সুমিত ঃ সিক্স্-এ থার্ড হয়েছিলাম, সেভেন-এ সেকেন্ড। এইট থেকে প্রতি বছর ফার্স্ট হয়েছি।

আমি ঃ স্কুলের পড়াশোনার বাইরে কোন্ ধরনের বই পড়তে ভালোবাসো?

সুমিত ঃ সাহিত্যই বেশী। কবিতার চেয়ে গল্প-উপন্যাস আমার বেশী ভালো লাগে। মাসিক আনন্দমেলায় একটা ধারাবাহিক কিশোর-উপন্যাস, কাপালিকরা এখনও আছে—গত বছর বেরুত, আমার খুব ভালো লেগেছিল।

আমি ঃ মাসিক আনন্দমেলা তুমি এখনও পড়ো?

সুমিত ঃ খুব আগ্রহ নিয়ে নিয়মিত পড়ি। নরেন্দ্রপুরে থাকার সময় থেকেই পড়ছি। নানা ধরনের ফিচারগুলো আর টিনটিন আমার খুব ভালো লাগে। **গত বছর শারদীয়া সংখ্যায় হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা-র্থীদের জন্যে একটা লেখা বেরিয়েছিল—হেড এগজামিনারদের উপদেশ 'কী করে নমবর বাড়াতে হয়'—সেটা পড়ে আমার উপকার হয়েছিল।** ওই পত্রিকাটা কি পাক্ষিক করা যায় না? পড়তে এত ভালো লাগে, কিন্তু দু-একদিনেই পড়া হয়ে যায়। তারপর তো আবার সেই একমাস পর!

আমি ঃ তুমি কি গল্প-টল্প বা প্রবন্ধ লেখো?

সুমিত ঃ স্কুল ম্যাগাজিনে বিজ্ঞান-বিষয়ক অনেকগুলো প্রবন্ধ আর মাঝে-মাঝে কোনও জায়গা বেড়িয়ে এসে ভ্রমণ কাহিনী ধরনের লিখেছি।

—অমর বাউল

এবারকার আনন্দমেলা পুজাবার্ষিকীতেও বার হবে **কী করে নম্বর বাড়াতে হয়**

কাজে লাগানো

আশাপূর্ণা দেবী

অ্যাঁ! চুরি!

এত বড় ওজনের একখানা চুরি! খোদ রাজবাড়িতে! স্বয়ং মহারাজের জন্মদিনে, একেবারে রাজ-অন্দরের খাসমহল 'মচ্ছ-মহল' থেকে! খবরটা শুনেই মহারাজা খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বার করতে গেলেন, কিন্তু অনেক দিনের মরচেয় খাপের সঙ্গে জম্পেস হয়ে আটকে থাকার দরুন তলোয়ার আর খাপ থেকে বেরোতে রাজী হল না।

রাজা রেগে গলদঘর্ম হয়ে হাঁক পাড়লেন, "কে আছিস, বড়-মন্ত্রীকে ডেকে আন্!"

বড়মন্ত্রী পাকা দাড়িতে চিরুনি চালাতে চালাতে এসে বললেন, "কী ব্যাপার?"

রাজা আমড়া-খাওয়া হেন গোমড়া মুখে বললেন, "ব্যাপার গুরুতর! রাজবাড়িতে চুরি!"

বড়মন্ত্রী চিরুনির মোটা দিকটা ঘুরিয়ে সরু দিকটা দিয়ে আঁচড়ে নিয়ে নিশ্চিন্দি গলায় বললেন, "এই কথা! এই নিয়ে হৈচৈ? মহারাজ কি ভোরে সূর্য্যি উঠলে আশ্চয্যি হন? না সন্ধেয় অন্ধকার নামলে? চুরির মতন এমন স্বাভাবিক ঘটনা জগতে আর কী আছে? রাজ্যে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা অহরহ কত চুরি হচ্ছে। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, খালে-বিলে, নদী-নালায়, সর্বত্রই চুরির চাষ! পুকুরকে পুকুর, পাহাড়কে পাহাড়, কী না চুরি হচ্ছে! চুরি নিয়ে আপনার দামী মাথাটা ঘামিয়ে জখম করবেন না।"

রাজা বললেন, "দেখো মন্ত্রী, তুমি আমায় বোকা পেয়ে ছেলে ভুলোতে এসো না। রাজ্যের সর্বত্র চুরি হচ্ছে বলে, খোদ রাজ-অন্দরে চুরি হবে? দেশে একটা সভ্যতা-সম্ভ্রম নেই? সাত মহলের শেষ মহল হচ্ছে অন্দর মহল, আবার তার মধ্যে পাঁচ মহলের শেষ মহল হল গিয়ে 'মচ্ছমহল'।

মন্ত্রী ঘাড় নেড়ে বললেন, "তা বটে! রাজবাড়িতে মামার বাড়ির আবদার চলতে পারে না। কিন্তু মহারাজ, ওই পাঁচ-মহলের বাকী মহলগুলো কী?"

রাজা তপ্ত হয়ে বললেন, "মন্ত্রী, বুড়ো হয়ে সব বিস্মরণ হলে না কি? রান্নাবাড়ির নাম খোদ অন্দরমহল না? তার পাঁচ মহলের নাম 'অন্নমহল', 'ব্যঞ্জনমহল', 'মিষ্টিমহল', 'মাংসমহল' আর 'মচ্ছমহল' না? শেষটারই সব থেকে শক্ত পাহারা না?"

ব্যাপারটা তাই। খাঁটি বাঙালী রাজা মহারাজা বিশাল-নারায়ণ বর্মন! তাঁর ওই শেষ মহলটিতেই যত্ন বেশী।

মন্ত্রী বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে! তা চুরিটা কী গেল?"

বিশালনারায়ণ হাঁড়ির মত মুখ করে বললেন, "কী চুরি গেল, সেটা তো কথা নয় মন্ত্রী! কেন চুরি গেল সেটাই কথা।"

মন্ত্রী বললেন, "তা বটে!"

"তবে তলব করো যত সেপাই শান্ত্রী, পাহারাদার দ্বাররক্ষী, আর দেউড়ির দারোয়ানদের।"

মন্ত্রী বললেন, "বেশ!"

কিন্তু আসলে কী চুরি গেছে না জেনে কি আর তদন্ত করা চলে? মন্ত্রী-মশাই রান্নাবাড়ির খাশ চাকরের খাশ খিদমদগারের খাশ চাকরানীর কাছে তল্লাস করে করে খবর জানলেন! জেনে মাথায় হাত দিলেন।

সর্বনেশে কাণ্ড!

এ-চুরির ফয়সালা না হলে, মন্ত্রিত্বপদ থাকবে?

রাজার জন্মদিনে সোনাইদিঘিতে জাল ফেলিয়ে রাজার জন্যে যে দেড়মনী পাকা রুইটি তোলা হয়েছিল, আর তিনজন জেলেয় মিলে কুড়ুল দিয়ে যার বিরাট মুড়োটা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলে রাজরান্নাঘরের দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এবং স্বয়ং মহারানী যে মুড়োটিকে স্পেশাল উনুন জেবলে রাজার মনের মত করে তেল-তেল করে মাখা-মাখা সর্ষের ঝাল রেঁধে রেখেছিলেন রাজামশাইয়ের জন্মদিন বাবদ, সেই মুড়োটি চুরি গেছে! রান্না হয়ে গেলে মচ্ছমহলে প্রকাণ্ড এক রুপোর গামলায় চাপিয়ে কাঁচালংকা ছড়িয়ে-ছড়িয়ে রেখে মহারানী আগুনতাত থেকে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে টানা পাখার তলায় হাওয়া খেতে বসেছিলেন, রাজার ভাত বাড়বার সময় দেখেন মুড়ো হাওয়া।

এর পরেও রাজামশাই খাপ থেকে তলোয়ার বার করতে যাবেন না? বেরোল না তাই, নইলে একধার থেকে সক্কলের গর্দান যেত না?

যাক্, এখন আর মহারাজা তাঁর দামী মাথাটা ঘামাচ্ছেন

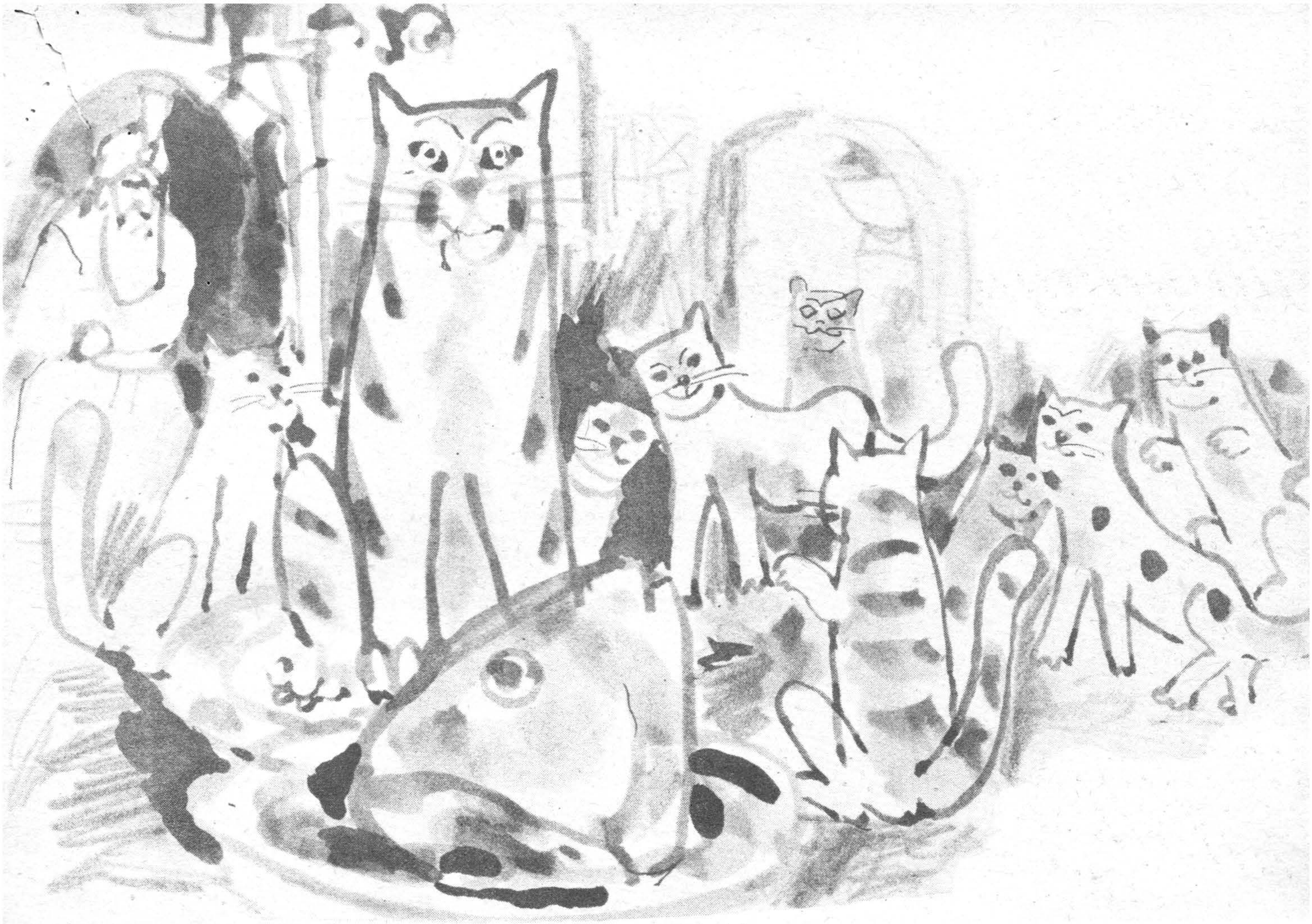

না, বড়মন্ত্রী যখন তদন্তের ভার নিয়েছেন।

আঁচড়ানো দাড়ি বাতাসে খোড়ো বাড়ির চালের মত উড়তে থাকে, মন্ত্রী নাগরা জুতো লটপটাতে-লটপটাতে দরবার-হলের সেজো-সিংহাসনে গিয়ে বসে সিংদরজার দারোয়ান ব্রজগোবিন্দ সরখেলকে ডাক পাড়ান।

আগের আমলে দারোয়ান ছিল সব ভোজপুরী। এখন একধার থেকে সব বাঙালী পাহারাদার বসানো হয়েছে।

তবে তারা পাগড়ি পরে, কুর্নিশ করে।

ব্রজগোবিন্দ কুর্নিশ করে বলল, "কী বলুন?"

বড়মন্ত্রী রেগে বললেন, "কী রকম পাহারাদার? রাজ অন্দরে চুরি! তুমি না সিংদরজার হেড্ রক্ষী? চোখ তাকিয়ে থাকো না ঘুমোও?"

ব্রজগোবিন্দ ফের কুর্নিশ করে বলল, "সিংদরজা দিয়ে চোর সেঁধোয় শুনেছেন কখনো?"

বড়মন্ত্রী দাড়ি নেড়ে বললেন, "তা বটে, তা বটে।"

তবে দ্বিতীয় মহলের দ্বারী দ্বারকেশ্বর দলুইকে তলব করো।...দ্বারকেশ্বর দলুই—তার নামে যে অভিযোগ হয়েছে, তা শুনে—বলল, "মন্ত্রীমশাই, আমার দরজা দিয়ে একটি ছুঁচও গলে যেতে পারে না।"

মন্ত্রী বলেন, "বলি, ছুঁচ না গলুক, হাতি গলে না?"

দ্বারকেশ্বর একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে, সেটা খিড়কি-দোরে।"

মন্ত্রী মাথা হেলিয়ে বলেন, "তাও তো বটে।...ডাক তবে খিড়কির দারোয়ানকে।"

রাজার চাকর তপাই বলল, "উঁহু, তা হবে না, একে একে সাত দেউড়ি তদন্ত হোক।"

তবে হোক।

তিনমহলের দেউড়ির পাহারাদার হাই তুলতে তুলতে এসে বলল, "রাত জাগা আমার সয় না, ঘুম না হলে পেটের মধ্যে হুট-পাট করে, কিন্তু চোরের নাক গলাবার জো রেখেছি ভেবেছেন? দেউড়ি থেকে চলন-ঘর পর্যন্ত গালচের মত পুরু করে চোরকাঁটা বিছিয়ে রেখে ঘুমোতে যাই।"

চারমহলের শান্ত্রী আরও চালাক, সে দেউড়ির দরজায় ঘণ্টা ফিট করে রেখেছে, দরজায় হাত দিয়েছ কি ঘণ্টারা বেজে উঠবে ঢংঢং টুংটাং ঠুন্‌ঠুন্।

একে-একে সব মহলের দ্বারীদের জেরা করলেন বড়মন্ত্রী; দাড়ি নেড়ে নেড়ে, দেখলেন, মানে শুনলেন, চোর আসবার পথ কেউ কোনওখানে রাখেনি। রাখে না।

তবে?

তবে তেল-তেল করে সর্ষের ঝাল রাঁধা সেই দেড়মনী মাছের মাথাটা গেল কোথায়? তাও রাতে নয়, দিনে দুপুরে।

দিনে দুপুরে!!

শুনে পাহারাদার মহলে হৈচৈ পড়ে গেল!

দিন দুপুরের চুরির জন্যে রাত-পাহারাদের জেরা! এ কি মামদোবাজি না কি? চিৎকার করে উঠল সবাই 'প্রতিবাদ! প্রতিবাদ!' হেড্ দারোয়ান ব্রজগোবিন্দ এসে বলল, "মন্ত্রীমশাই, দিনের পাহারাদাররা গেল কোথায়?"

বড়মন্ত্রী অবাক হয়ে বললেন, "তাই তো, গেল কোথায়?"

প্রধানা পরিচারিকা মহিষমর্দিনী বলল, "তারা সবাই মিলে খিড়কি পাহারা দিচ্ছে।"

খিড়কিতে সবাই। ব্যাপার কী! নিশ্চয় সব রহস্য ওইখানে।

বড়মন্ত্রী সদলবলে—মানে সাত দেউড়ির সব পাহারাদার আর রাজবাড়ি ঝেঁটিয়ে যত দাসদাসী এগিয়ে গিয়ে দেখে, খিড়কি দরজার পাশে অনেক লোকের গুলতানি।

এখানে কী? এখানে কী?

গুলতানরা চুপ মেরে বলে উঠল, "কিছু না মন্ত্রী মশাই, কিছু না, এমনি দাঁড়িয়ে আছি সবাই।"

বড়মন্ত্রী অবাক! "কাজকর্ম ফেলে সবাই এমনি দাঁড়িয়ে আছ? দেখতে হবে—"

বলে লোকজনকে ঠেলে ঠেলে যেতে যাবেন, হাঁ হাঁ করে ওঠে সবাই, "পড়ে যাবেন! পড়ে যাবেন।"

মন্ত্রী রেগে বললেন, "বটে, তোমরা কেউ পড়ছ না, আর আমিই অমনি পড়ে যাব? বুড়ো হয়েছি বলে আমায় এত অবজ্ঞা?"

বলেই না সামনের লোক দুটোকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন তড়বড়িয়ে। বাস! মন্ত্রিমশাইয়ের চিহ্ন নেই আর!

দেড় ফুট লম্বা সাদা দাড়ি আর জরির কোমরবন্ধ আঁটা সাদা রেশমী পোশাক সমেত বড়মন্ত্রীমশাইয়ের আড়াইমনী দেহটি, রাজার দেড়মনী মাছের মুড়োটার মতই মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে গুলতানবাজরাও এদিক-ওদিক ছিটকে হাওয়া, পাহারাদাররা হাঁ।...এ কী তাজ্জব!

সামনে ইয়া-বড়-মুখ এক সুড়ঙ্গ, বড়মন্ত্রীমশাই তার মধ্যে দিয়ে তলিয়ে গেছেন।

গেছেন তো গেছেন, গড়গড়িয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে কোন্ পাতালে। মাথা ঝাঁকিয়ে কোমর বাঁকিয়ে উঠে দেখেন দিব্যি গোটা-গোটা সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন মন্ত্রী-মশাই কোমরে হাত দিয়ে দিয়ে। মাথায় পাগড়ি তাই মাথাটা বেঁচেছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বড়মন্ত্রী মশাই 'থ'।

এ যে একেবারে রাজ-রাস্তায় উঠে এলেন। চেনা জায়গা। সিঁড়ির মুখে রাজবাড়ির হেডরাঁধুনীর বাড়ির পাশ-দরজা। হেড্‌রাঁধুনীর ছেলের বিয়েতে এসেছিলেন, বাপের শ্রাদ্ধতেও এসেছিলেন। রাজবাড়ির হেডরাঁধুনীর মান তো কম নয়।

বড়মন্ত্রী মশাই কোমর ডলতে ডলতে হাঁক দিলেন, "বাড়িতে কে আছ?"

মানুষের গলা শুনতে পেলেন না, শুধু ভারী গলার একটা 'গরর্ গরর্' শব্দ পেলেন। সর্বনাশ!

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল মন্ত্রীমশাইয়ের। হেড-রাঁধুনী টঙ্কবল্লভ গুণাকর বুড়ো বয়েসে বাঘ পুষছে! মন্ত্রী কি আবার ওই সুড়ঙ্গ পথে নেমে যাবেন? 'গরর...গরগরর...গর' আওয়াজ যে বাড়ছে। কিন্তু কী করে যাবেন? এদিকে নয়, সিঁড়ি আছে ওদিকে? ওদিকে তো গর্তে পা ফেলে গড়গড়িয়ে গড়িয়ে এসেছেন।...আস্তে-আস্তে পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেলেন দালান পার হয়ে পড়লেন, আর পড়েই সামনের জানলা দিয়ে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেলেন।

গন্ধমাদনের চুড়োর মত, বিরাট এক মাছের মুড়োর ওপর বসে আছে একটি বেঁটে খাটো গোলগাল গিন্নীবান্নি কেঁদো বাঘ।...আর ওই মুড়োটাকে ঘিরে একরাশ হৃষ্টপুষ্ট বেড়াল মহোল্লাসে শাঁস খুবলোচ্ছে।

যেন তুলোছেঁড়া বালিশের চারধারে নেংটি ইঁদুরের মহো-ল্লাস। দৃশ্যটা দেখে মন্ত্রীমশাইয়ের এমন কম্প শুরু হল যে, 'বু বু বু বু' শব্দ করতে করতে গড়িয়ে পড়লেন।

বেড়ালগুলো একসঙ্গে মিউমিউ করে উঠল, বাঘটা 'গরগর'।

ওদের শব্দে কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এল টঙ্কবল্লভ গুণাকর। এসেই আর্তনাদ করে উঠল, "এ কী মন্ত্রীমশাই, আপনি এখানে? এ কী অবস্থা! কই রে, কে আছিস? জল আন্, পাখা আন্।"

মন্ত্রীমশাই 'বুবু' করে বললেন, "জল থাক, আগে তোমার ওই বাঘ সরাও বাবা।"

"বাঘ!"

টঙ্কবল্লভ মাথায় হাত দেয়, "বাঘ কোথায়? ও তো আমার পোষা বেড়াল আহ্লাদী!"

"ও তোমার বেড়াল? আমায় কি খোকা পেয়েছ টঙ্ক?"

টঙ্ক বলে, "এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি মন্ত্রীমশাই, সেরেফ বেড়াল। ইয়ে মানে রাজরান্নাঘরের দুটো ভালমন্দ খেয়ে খেয়ে গতরটি একটু হয়েছে ভাল। ওর ছানাপোনাদেরও মন্দ নয়। ওই যে দেখুন না মায়ের সঙ্গে খেলছে।"

মন্ত্রী বললেন, "বুঝেছি। রহস্য ফাঁস হল। কিন্তু মুড়ো কি রোজই চুরি যায়?"

টঙ্ক মাথা চুলকে ঘাড় হেঁট করে মুচকি হেসে বলে, "আজ্ঞে না, তা নয়, মহারাজের ভোগের পর পাতের মুড়োটা পেসাদ পায় বেটি, আজই কেমন ভুলক্রমে কাজটা আগে-ভাগে করে ফেলেছে। যতই হোক জানোয়ারের বুদ্ধি তো? সময় ঠিক করতে পারেনি। ঘড়ি না দেখেই সুড়ঙ্গ-পথে নেমে গেছে, না বুঝে সুড়ঙ্গ দিয়ে পাচার করে এনে—"

মন্ত্রী আগুন হয়ে বলেন, "না বুঝে? আস্ত কি ভাঙা বোঝে না ও?"

টঙ্কবল্লভ বলে, "সে কি মন্ত্রীমশাই, ভাঙা কেন হতে যাবে? পেসাদ তো রোজ আস্তই থাকে। রাজামশাইয়ের তো শুধু দৃষ্টিভোগ! খেয়ে থাকেন তো শুধু জলসাবু।"

জলসাবু? শুধু জলসাবু খেয়ে থাকেন মহারাজা!

টঙ্ক জিভ কেটে বলে, "এই মরেছে, বলে ফেললাম। একথা যেন ফাঁস হয় না মন্ত্রীমশাই, তাহলে টঙ্কর ফাঁসি।"

মন্ত্রী দেখেন, আহ্লাদী তখন সপরিবারে মুড়োটাকে কায়দা করে ফেলেছে।...গা করকর করে ওঠে বড়মন্ত্রীর। কড়া গলায় বলেন, "তা রোজই বা বেড়ালের ভোজে লাগে কেন? মহারানী খেতে পারেন না?"

"হুঃ। তাঁর ভাগের ল্যাজাটাই কে খায় তার ঠিক নেই। দাসীদের খেয়ে-খেয়ে অরুচি।"

"বলি তোমরাও তো খেতে পারো।"

"আজ্ঞে আমার কথা বাদ দিন। মচ্ছমহল মিষ্টিমহল মাংস-মহল অন্নমহল সকল মহলের দাসদাসীরই খাওয়ায় অ্যালার্জি। খেয়ে খেয়ে—"

মন্ত্রী বললেন, "তা অন্য দিকে দু-একদিন ছুঁড়ে মারা যায় না?"

টঙ্কবল্লভ জিভ কাটে, "সর্বনাশ! তাহলে তো রাজামশাইয়ের জলসাবুর ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাবে।"

মন্ত্রীমশাই দাড়ি নেড়ে নেড়ে বলেন, "তা বটে! কিন্তু এত-বড় সুড়ঙ্গটি কাটল কে?"

টঙ্কবাহাদুর একমুখ হেসে বলে, "আজ্ঞে সে-কষ্ট আমাদের করতে হয়নি, পূর্বপুরুষরা করে গেছলেন। মানে রাজবাড়িতে হঠাৎ শত্রু-আক্রমণ হলে মহারানীরা সুড়ঙ্গ-পথে পালাবেন বলে করা। তা জিনিসটা যখন রয়েছে, কাজে লাগানো ভাল। শত্রু আক্রমণ তো আর নেই একালে!"

বানাও

এক বালতি জলে রাজহাঁসটি চলে

আকাশে এখন রোজই মেঘ। আর রোজই বৃষ্টি। খাল-বিল, নদী-নালা, পুকুর-দিঘি সব টইটম্বুর জলে। এই জলে মাছেদের ভারী সুখ। মনের সুখে দৌড়-ঝাঁপ জলের মাঠে-ময়দানে। আর জলের উপরে সুখ হাঁস, রাজহাঁসেদের। যাদের পুকুর আছে, তারা রোজই দেখে মজা পায় হাঁসেদের সাঁতার, ডুব-সাঁতার। এই ছিল ডাঙায়। এই ঝাঁপ দিল জলে। জলে ডুবছে। অথচ পালক ভিজছে না। কমলালেবু-ঠোঁট আর কাগজ-সাদা পালকের এই হাঁসগুলোকে দেখলেই সত্যি-সত্যি আদর করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমরা যারা শহরে থাকো, যাদের পুকুর নেই, দিঘি নেই, তাদের মনে ভারী দুঃখ। কোনদিন হাঁস বা রাজহাঁসের জলের খেলা দেখতে পেলে না বলে। তবে ইচ্ছে করলেই কিন্তু এই দুঃখটাকে তোমরা মুছে ফেলতে পারো মন থেকে। পুকুর নেই তো নেই, জল তো আছে। এক বালতি জলেই যে-যার নিজের রাজহাঁসটিকে ভাসাতে পারো নিজের হাতে। কী বলছ? রাজহাঁসটা কোথায় পাবে? ওঃ, সে আর এমন কী শক্ত ব্যাপার। নিয়ে এসো দেখি চারচৌকো কাগজ খানিকটা।। বানিয়ে ফেলি ঝপাঝপ্।

পূর্ণেন্দু পত্রী

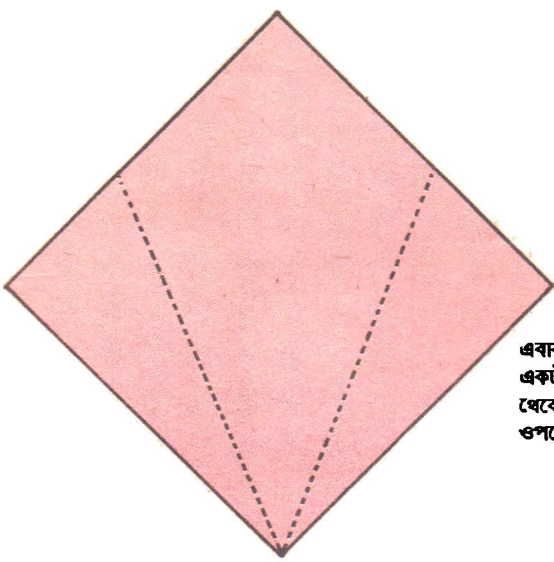

ভাঁজের দাগ দেখে দু দিকের কোণকে নিয়ে এসো মাঝামাঝি।

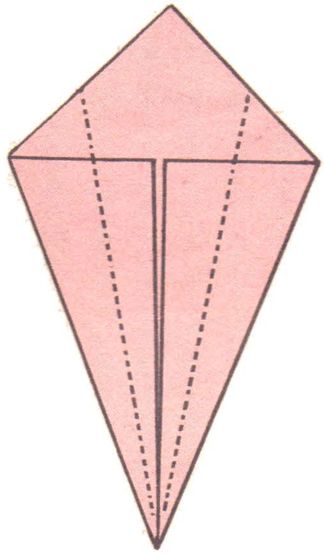

আবার এটাকেও দুদিক থেকে মোড়ো ভাঁজের দাগ দেখে।

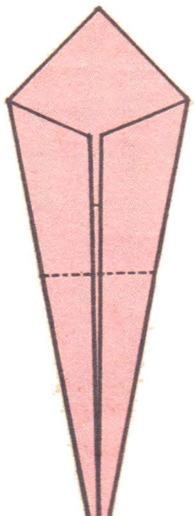

এবার উল্টে নাও কাগজটাকে। মাঝখানে একটা ভাঁজের দাগ আছে। সেই দাগ থেকে নীচের অংশটাকে তুলে নাও ওপরে।

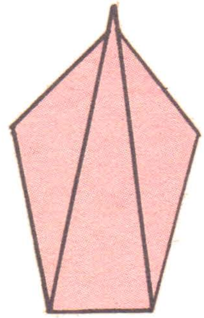

এবার কাগজটা মুড়ে নাও দুপাশে। দেখতে হবে নীচের ছবির মত।

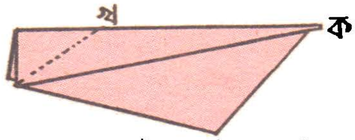

এবার ক কোণটা ধরে টান দাও উপরে, খ কোণের কাছ থেকে মুড়ে।

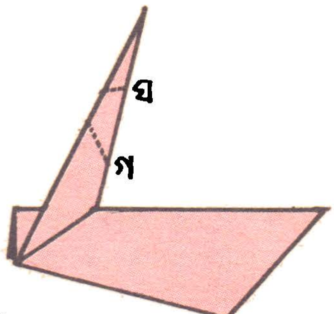

ভাঁজের দাগ দেখে প্রথমে মুড়ে নাও গ কোণ। তারপর ঘ কোণ।

এবার বল, সত্যি রাজহাঁসের চেয়ে এটা দেখতে কি খুব খারাপ? আর-একটা কথা। যারা ছবি আঁকতে জানো, তারা ইচ্ছে করলে ঠোঁটে একটু কমলা রঙ আর কালো রঙের চোখ আর পালকেরও খানিকটা এঁকে নিতে পারো এর গায়ে।

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
আমাকে মেরে ফ্যালো! নয়তো আমার গায়ে হানা দিয়েছ বলে আমিই তোমাকে মারব!
ওকে বলো, আমি আকাশ থেকে পড়েছি, তুমি আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখেছিলে।
তার দরকার কী! আমি তো তোমার সঙ্গে চলে যেতেই চাই!
আর দেরি করা ঠিক নয়...এর পরে হয়তো ভ্রিনোকে সাহায্য করতে...
অন্যেরা এখানে ছুটে আসবে!
এবারে দেখা যাক, রানী লা'র কী হল...
টারজান পড়ে যাওয়ায় রানী লা মর্মাহত! কিছু আর তার নজরে পড়ছে না..
হঠাৎ...
ওটা কী? পাহাড়? নাকি মস্ত একটা উঁইঢিবি?
আমরা যে ওরই মধ্যে ঢুকছি।
এরা কারা? মানুষ? নাকি আর-কিছু?.

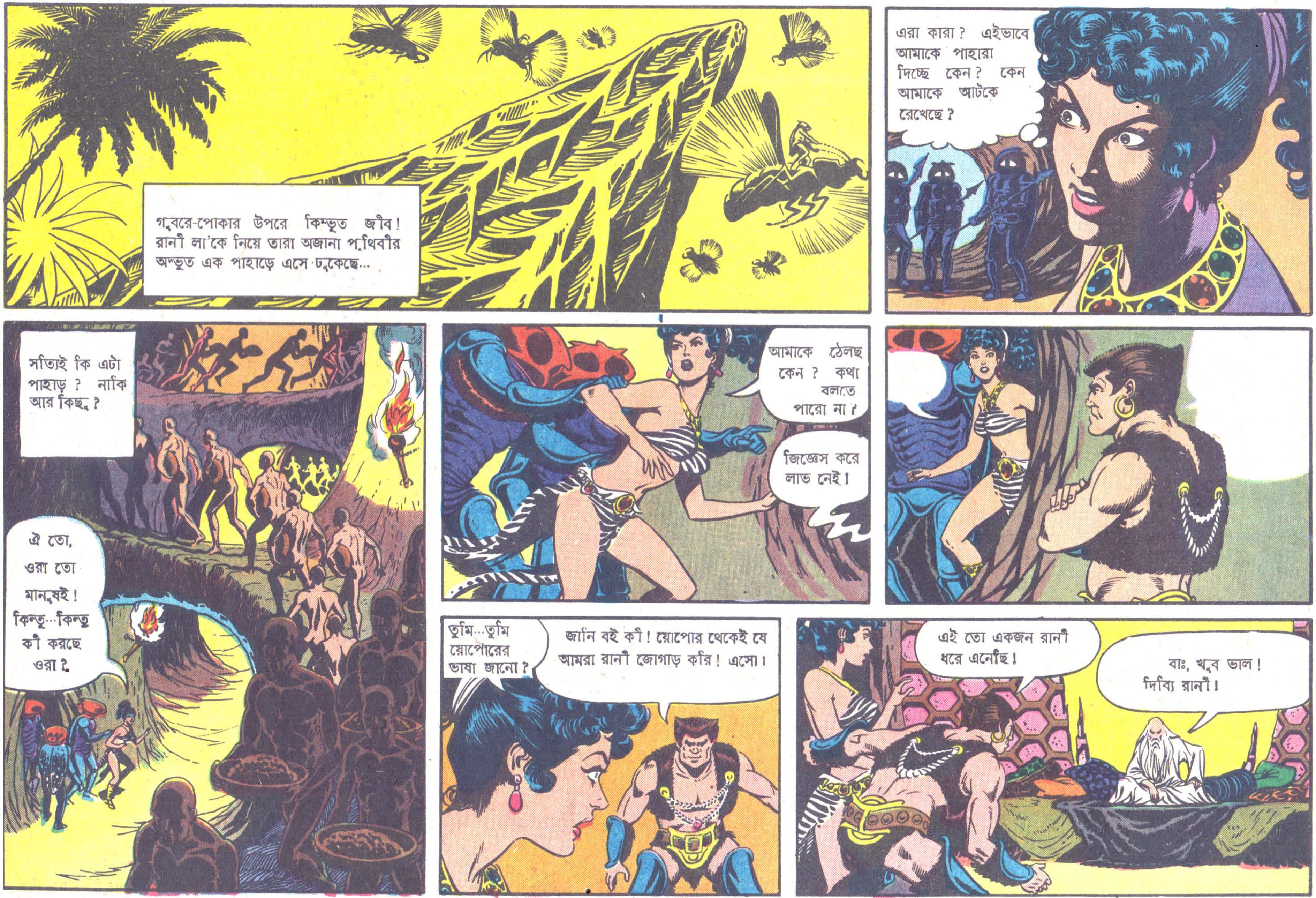

এর পর আঠারোর পাতায়

সবজান্তা

রমানাথ রায়

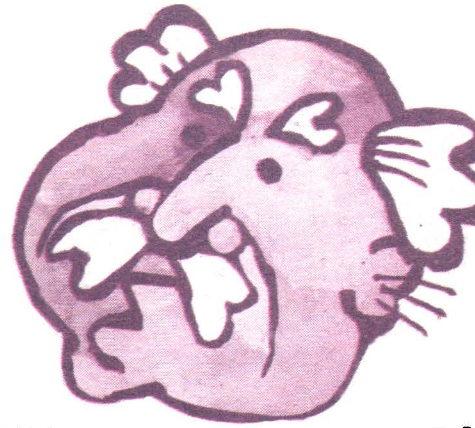

একটা লোক ছিল। সে সব সময় বই পড়ত। সব রকমের বই পড়ত। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, জ্যামিতি—কিছুই বাদ দিত না। সবাই তাকে 'চলমান বিশ্বকোষ' বলত। তবে ওর একটা দোষ ছিল। লোককে ধরে-ধরে নানা প্রশ্ন করত। আর সেসব কঠিন প্রশ্ন। যেমন : উটপাখির ডিমের ওজন কত? পৃথিবীতে প্রথম ছাপা বই কী? পিঁপড়েরা চিনি খায় কেন? রবীন্দ্রনাথ মোট কখানা বই লিখেছিলেন? কলম্বাসের বাবার নাম কী? সাহেবদের গায়ের রক্ত সাদা হয় কেন?

প্রায় কেউই এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত না। না পেরে তারা মনে মনে ভীষণ রেগে যেত। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারত না। লোকটা তাতে ভীষণ মজা পেত। তবে কেউ যদি কোনরকমে তার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়ে ফেলত, তা হলে তার আর রক্ষে থাকত না। লোকটা ভীষণ চটে যেত। আর চটে গিয়ে আরও কঠিন কঠিন প্রশ্ন করত। এমন কী, মাঝে মাঝে শব্দের বানান পর্যন্ত জিজ্ঞেস করত, অর্থ জিজ্ঞেস করত। ফলে তাকে কেউ দেখতে পারত না। সবাই এড়িয়ে চলত।

একদিন অনেকে মিলে ঠিক করল লোকটাকে জব্দ করতে হবে। কিন্তু কীভাবে করবে? লোকটা তাদের যেমন কঠিন-কঠিন প্রশ্ন করে, তারাও তেমনি তাকে কঠিন-কঠিন প্রশ্ন করবে। সবাই তখন নানা দেশের নানা পণ্ডিতদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করতে লাগল। নানা কঠিন প্রশ্ন জোগাড় করতে লাগল। তারপর প্রতিদিন লোকটার বাড়ি একজন করে যেতে লাগল। কঠিন-কঠিন প্রশ্ন করতে লাগল। সেসব প্রশ্ন ছিল অনেকটা এইরকম : কলার খোসায় মানুষ আছাড় খায় কেন? স্বপ্ন কী করে মাঝে মাঝে সত্যি হয়? মেয়েরা আরশোলা দেখলে ভয় পায় কেন? শেক্সপীয়র বলে সত্যি কেউ ছিল কি? পাগলকে পাগল বললে রেগে যায় কেন? সন্ধেবেলা অনেকে ছুঁচ বিক্রি করে না কেন?

লোকটার কাছে এসব প্রশ্ন একেবারে জলের মত। তাকে একেবারে ভাবতে হত না। মুখেমুখে উত্তর দিয়ে দিত। যারা বুক ফুলিয়ে আসত, তারা মুখ ম্লান করে ফিরে যেত। কেউই লোকটাকে জব্দ করতে পারল না। শেষে সবাই হেরে গিয়ে হাল ছেড়ে দিল।

আস্তে আস্তে লোকটার বয়েস বাড়তে লাগল। মাথার চুল সাদা হতে লাগল। সারা বাড়ি বইয়ে ভরে গেল। এমনকী, পা রাখার জায়গা রইল না। লোকটা আরও অনেক কিছু জানল। আরও অনেক পণ্ডিত হয়ে উঠল। লোকে তাকে আরও ভয় করতে লাগল।

কিন্তু একদিন একেবারে অন্যরকম একটা ঘটনা ঘটল। কোত্থেকে একটা ছেলে তার ঘরে এসে ঢুকল। লোকটা তখন চেয়ারে বসে পড়ছিল। মুখ তুলে তাকাল।

"কী চাই?"

"একটা কথা জানতে চাই।"

"কী?"

"আপনার কাছে মোট কত বই আছে?"

লোকটা এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল। কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। তারপর বলল, "কী হবে তোমার জেনে?"

"আমি জানতে চাই।"

"জেনে কী হবে?"

"জেনে কী হয়?"

"ঠিক আছে। কাল এসো। কাল বলব।"

ছেলেটা চলে গেল। লোকটা কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। কারণ, এরকম একটা প্রশ্ন কেউ যে তাকে কোনদিন করতে পারে তা সে ভাবতে পারেনি। তবে তার মনে হল, সে যখন এত জানে, তখন তার ঘরে কখানা বই আছে, তাও তার জানা উচিত ছিল। এটা তারই দোষ। তারই জ্ঞানের অপূর্ণতা।

লোকটা আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। তারপর প্রত্যেক ঘরে ঢুকে বই গুনতে লাগল। গুনতে-গুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার গুনতে শুরু করল। আবার গুনতে-গুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আবার বিশ্রাম করে আবার গুনতে শুরু করল। এইভাবে গুনতে-গুনতে সারা দিন চলে গেল। গোনা যখন শেষ হল তখন রাত সাড়ে এগারটা।

পরের দিন ছেলেটি আসতেই লোকটি বলল, "এক লক্ষ বাইশ হাজার সাতশো তেত্রিশ।"

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, "তাদের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা কত?"

লোকটা কোন উত্তর দিতে পারল না। চুপচাপ বসে রইল। তার মুখ চোখ দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু কী করবে? একটু পরে বলল, "এক সপ্তাহ পরে এস।"

ছেলেটা চলে গেল। লোকটা তারপর সারা সপ্তাহ ধরে একটা খাতায় প্রতি বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা পরপর টুকতে লাগল। টোকা শেষ হলে তাদের যোগ দিতে লাগল। দিতে-দিতে সে স্নান করার কথা ভুলে গেল। খাওয়া-দাওয়া ভুলে গেল। এত বড় যোগ সে জীবনে করেনি। করতে গিয়ে বারবার ভুল হতে লাগল। শেষে অনেক কষ্টে একটা যোগফল দাঁড় করাল। বারবার সেটা মিলিয়ে দেখল। ঠিক আছে। কোন ভুল নেই। লোকটা নিশ্চিন্ত হল।

ছেলেটা এক সপ্তাহ পরে এল।

লোকটা তাকে দেখেই বলল, "তিন কোটি সাতাশি লক্ষ একান্ন হাজার পাঁচশো দুই।"

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, "মোট লাইন কত?"

এবার লোকটা ভীষণ রেগে গেল। কিন্তু এবারেও কিছু বলতে পারল না। কী বলবে? সে তো সত্যি-সত্যি এর উত্তর জানে না। এসব সে কোনদিন গুনে দেখেনি। গোনবার কথাও তার মনে হয়নি। কিন্তু করার কিছু নেই। ছেলেটাকে লোকটা একমাস পরে আসতে বলল। লোকটা একমাস ধরে সব বইয়ের লাইন গুনতে লাগল। গুনে-গুনে খাতায় টুকে যোগ করতে লাগল।

ছেলেটা এক মাস পরে এল। লোকটা তাকে যোগফল

বলল। কিন্তু ছেলেটার প্রশ্ন শেষ হল না। বাক্যের সংখ্যা জানতে চাইল। লোকটা একদিন তার উত্তর দিল। ছেলেটা তারপর শব্দসংখ্যা জানতে চাইল। লোকটা একদিন তারও উত্তর দিল। ছেলেটা তারপর অক্ষরের সংখ্যা চাইল। লোকটা একদিন তারও উত্তর দিল। তবুও ছেলেটা পরপর প্রশ্ন করেই চলল। সে একে-একে বইগুলোর দাম জানতে চাইল। প্রকাশকদের নাম জানতে চাইল। মুদ্রকের নাম জানতে চাইল। উত্তর দিতে-দিতে লোকটা একদিন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ছেলেটাকে বলল, "কী হবে এসব জেনে?"

ছেলেটা পাল্টা প্রশ্ন করল, "কী হবে উটপাখির ডিমের ওজন জেনে?"

লোকটা কোন উত্তর দিতে পারল না। মাথা নিচু করে বসে রইল।

ছেলেটা আবার প্রশ্ন করল, "কী হবে উটপাখির ডিমের ওজন জেনে?"

গল্প শুনতে লাগল।

একসময় একটা ছোট ছেলে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি গল্প জানো?"

"গল্প?"

"হ্যাঁ, গল্প।"

লোকটা খুব অবাক হয়ে গেল। "কিসের গল্প?"

"ভূতের গল্প।"

আর একজন পাশ থেকে বলে উঠল, "হাসির গল্প।"

আর-একজন চেঁচিয়ে উঠল, "ডিটেকটিভ গল্প।"

লোকটা চুপ করে বসে রইল। তাই দেখে একটা লাজুক ছেলে আস্তে আস্তে বলল, "তুমি যা জানো তাই বলো।"

লোকটা কোনদিন কাউকে গল্প বলেনি। কেউ তার কাছ থেকে কোনদিন কোন গল্প শুনতে চায়নি। সে চিরকাল লোককে প্রশ্ন করে এসেছে। লোকেরা চিরকাল তাকে প্রশ্ন

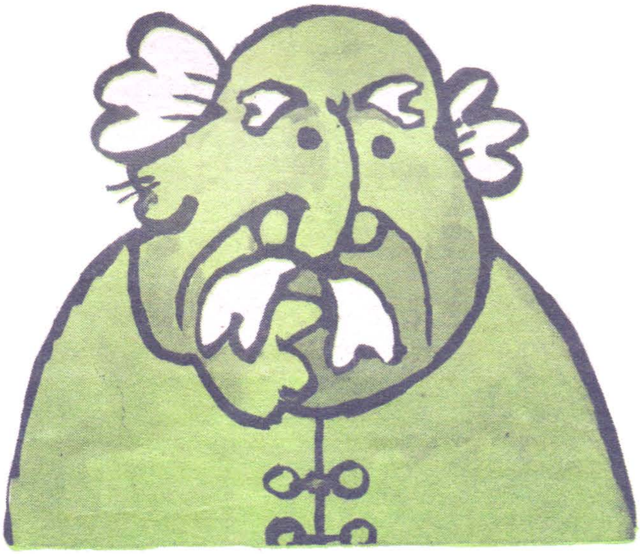

লোকটা এবারেও উত্তর দিতে পারল না। আগের মত মাথা নিচু করে বসে রইল।

ছেলেটা তারপর চলে গেল। আর কিছু প্রশ্ন করল না। লোকটা বসে বসে ভাবতে লাগল: কী হবে উটপাখির ডিমের ওজন জেনে?

লোকটা সব কাজ ভুলে গেল। ঐ এক প্রশ্ন তার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। একদিন চলে গেল। দুদিন চলে গেল। এক সপ্তাহ চলে গেল। একমাস চলে গেল। তবু কোন উত্তর তার মাথায় এল না। শেষে নিজেকে জিজ্ঞেস করে বসল, "আমি এতকাল এসব জেনেছি কেন? কিসের জন্যে জেনেছি? কার জন্যে জেনেছি?"

লোকটার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে চুপ-চাপ বসে রইল। একবারও রাস্তায় বেরোল না। কারও সঙ্গে কথা বলল না। বলতে ইচ্ছে হল না। এমন কী, একটা বইয়ের পাতা পর্যন্ত ওল্টাল না। ওল্টাতে ভাল লাগল না।

একদিন বিকেলে কী মনে হল লোকটার। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে একটা পার্কের মধ্যে এসে ঢুকল। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। সামনে ছোট-ছোট ছেলেরা বসে গল্প করছিল। সে-সব নানা মজার গল্প। লোকটা এসব গল্প কোনদিন শোনেনি। কোন বইয়ে পড়েনি। লোকটা অবাক হয়ে সেসব

করে এসেছে। সে প্রশ্ন করতে জানে। সে উত্তর দিতে জানে। সে কি আজ গল্প বলতে পারবে? তবু লোকটা একবার চেষ্টা করে দেখল। সে আস্তে আস্তে শুরু করল, "এক দেশে এক বিরাট পণ্ডিত ছিল। সে খুব বই পড়ত। তার কোন বন্ধু ছিল না। তাকে সবাই ভয় করত। তাকে কেউ ভালবাসত না। একদিন হয়েছে কী......"

ছোট ছোট ছেলেরা অবাক হয়ে তার গল্প শুনতে লাগল। লোকটা গল্প বলতে লাগল। বলতে বলতে কখনো তার গলার স্বর উপরে উঠল। কখনো নীচে নামল। গল্প যখন শেষ হল, তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে।

ছেলেরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সবাই প্রায় একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল, "আর একটা বলো। আর একটা বলো।"

লোকটা এবার উঠে পড়ল। বলল, "কাল এসো। কাল বলব।"

লোকটা তারপর প্রতিদিন বিকেলে পার্কে এসে ছোট ছোট ছেলেদের গল্প বলতে লাগল। দেখতে-দেখতে তার শ্রোতার সংখ্যা বেড়ে গেল। তার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করল। উটপাখির ডিমের ওজন নিয়ে তার আর মাথাব্যথা রইল না। তার বইগুলো সব পোকায় কাটতে লাগল।

পনেরোর পাতার পর

আমরা বুড়ো হয়ে গেছি! এবার নতুন রাজা-রানী হবে! এটা খেয়ে নাও!
না, কিচ্ছু খাব না!
এই, ওকে আটকাও!
বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে!
খাও বলছি!
দিব্যি রানী! চমৎকার রানী! খুব ভাল হল!
কী খেলুম? ভারী সুন্দর স্বাদ!
খেতে খারাপ লাগলে তুমি মারা পড়তে!
এখন থেকে তুমিই এখানকার রানী।
জয় রানী-মা!
তার মানে? না না, তোমাদের রানী হবার কোনও ইচ্ছে আমার নেই!
আর তা ছাড়া, এই পাহাড়টা উঁইঢিবির মতো দেখতে কেন?
বাঃ রে, আমরা যে উঁইপোকার খুব ভক্ত! অনেক ব্যাপারেই আমরা তাদের নকল করি।
যেমন, আমরা সবাই একই রানী-মায়ের সন্তান!
বলো কী?
ঠিকই বলছি।
সরে যাও!

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

উপন্যাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সবুজ দ্বীপের রাজা

আগে যা ঘটেছে

'ভয়ংকর সুন্দর'-এর সেই সন্তু আর কাকাবাবু এবার অভিযানে এসেছে আন্দামানে। পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকরা মাঝে মাঝে এসেছেন আন্দামানে, তারপর তাঁদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এবারেও ওরা দেখেছে, কয়েকজন সাহেব মোটরবোট চেপে কোথাও পালিয়েছে। সেই রহস্যের সন্ধানে কাকাবাবুও সন্তু আর দাশগুপ্ত নামের একটা লোককে নিয়ে মোটরবোট চেপে সমুদ্রের ওপর বেরিয়ে পড়েছিলেন। বোট এসে থামল রংগত নামের একটা জায়গার কাছাকাছি বন্দরে। সবাই পাড়ে উঠে এসেছে, এমন সময় কাকাবাবু বললেন, তিনি চশমাটা ফেলে এসেছেন বোটে। সেটা তিনি আনতে গেলেন, অমনি বোটটা তাঁকে নিয়ে ছেড়ে চলে গেল। তারপর—

৬

সন্তু তাড়াতাড়ি ছুটে এল জেটির কাছে। মোটরবোটটা সাঁ করে জল কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দাশগুপ্ত তার পাশে এসে বলল, "সর্বনাশের ব্যাপার! মোটরবোটটা আপনা-আপনি চলতে লাগল নাকি? তা হলে কী হবে? শংকরনারায়ণ, শংকরনারায়ণ?"

বোটের চালক শংকরনারায়ণও বোটটার দিকে তাকিয়ে দেখছে। লোকটি খুব কম কথা বলে। এবার সে বলল, "বোট কখনো আপনা-আপনি চলে! ওটা তো উনি চালাচ্ছেন।"

দাশগুপ্তর চোখ ট্যারা আর মুখ হাঁ হয়ে গেছে। সে ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "উনি নিজে বোট চালাচ্ছেন? তা হলে উনি নিশ্চয় একলা-একলা জারোয়াদের কাছে যেতে চান। উঃ কী গোঁয়ার লোক রে বাবা! জারোয়ারা ওঁকে মেরে ফেলবেই। আমি গভর্নমেন্টকে কী জানাব?"

মোটরবোটটা এখনো দেখা যাচ্ছে। সন্তু চিৎকার করে ডেকে উঠল, "কাকাবাবু! কাকাবাবু!"

দাশগুপ্তও চ্যাঁচাল, "মিঃ রায়চৌধুরী!"

শংকরনারায়ণ গম্ভীরভাবে বলল, "উনি বেশী দূর যেতে পারবেন না। বোটে ডিজেল নেই। আমি এখান থেকে ডিজেল নেব ঠিক করেছিলাম।"

দাশগুপ্ত বলল, "অ্যাঁ? ডিজেল নেই? থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ শংকরনারায়ণ! তবে তো উনি আর জরোয়াদের জঙ্গলে যেতে পারবেন না!"

মোটরবোটটা কিন্তু ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সন্তু ভাবল, মোটর-বোটটার ডিজেল যদি ফুরিয়ে যায়, তা হলে কাকাবাবু মাঝ-সমুদ্রে একা-একা ভাসবেন? বোটে তো খাবার-দাবার কিছু নেই!

দাশগুপ্ত বলল, "উঃ, কী ডানপিটে লোক বাবা! তাও তো একটা পা কাটা। দুটো পা থাকলে আরও কী করতেন কে জানে। আচ্ছা, সন্তু, ওঁর একটা পা কাটল কী করে?"

"আফগানিস্তানে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।"

"ওরে বাবা, উনি আফগানিস্তানেও গিয়েছিলেন?"

শংকরনারায়ণ জেটির সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গিয়ে বালির চড়া ধরে দৌড়োতে লাগল। দূরে এক জায়গায় কয়েকটা মোটরবোট রয়েছে। ওর মধ্যে কোনোটা মাছ ধরার, কোনোটা মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার। একটু বাদেই শংকর-নারায়ণ একটা বোট চালিয়ে নিয়ে এল জেটির পাশে। তারপর বলল, "আপনারা একজন কেউ আসুন।"

দাশগুপ্ত বলল, "আমি যাচ্ছি। তুমি একটু থাকো সন্তু।"

সন্তু সে কথা শুনল না। সে লাফিয়ে গিয়ে মোটরবোটে উঠল।

শংকরনারায়ণ এত জোরে বোটটা চালিয়ে দিল যে, ওরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল আর-একটু হলে। সবাই শক্ত করে ধরে রাখল রেলিং।

একটু বাদেই আগের মোটরবোটটা দেখা গেল। সেটা এদিক-ওদিক এঁকে-বেঁকে যাচ্ছে। কাকাবাবু ভাল চালাতে পারছেন না। দাশগুপ্ত এদিক থেকে আবার চ্যাঁচাতে লাগল, "মিঃ রায়চৌধুরী, মিঃ রায়চৌধুরী!"

খানিকক্ষণ দুই বোটে পাল্লা চলল। কাকাবাবু থামতে চান না। তারপর হঠাৎ এক সময় কাকাবাবুর বোটটা থেমে গেল। মোটরবোট যখন সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলে, তখন তার একটা বেশ তেজী ভাব থাকে। থেমে গেলেই কী রকম যেন অসহায় দেখায়। ঠিক যেন একটা মোচার খোলা।

শংকরনারায়ণ প্রথমে এই বোটটা নিয়ে কাকাবাবুর বোটের চারপাশে বোঁ বোঁ করে ঘুরল কয়েকবার। তারপর একবার কাছাকাছি এসে একটা দড়ি নিয়ে ঐ বোটে লাফিয়ে পড়ল।

পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েও কাকাবাবুর কিন্তু লজ্জা নেই। বরং মুখে একটা রাগ-রাগ ভাব। কেউ কিছু বলার আগেই তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বোটটা হঠাৎ আপনা-আপনি থেমে গেল কেন?"

শংকরনারায়ণ বলল, "তেল নেই আর!"

কাকাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কেন, তেল থাকে না কেন?"

দাশগুপ্ত বলল, "স্যার, আপনি এটা কী করছিলেন? এরকম পাগলামি করার কোনো মানে হয়? ওদিকে রংগতে সবাই আমাদের জন্য খাবার-দাবার নিয়ে বসে আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি এখানে খেতে আসিনি। একটা কাজ করতে এসেছি।"

"কিন্তু কাজ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! কাজ মানে তো ঐ সাহেবগুলোকে খোঁজা? ওরা আর যাবে কোথায়?"

"আমি একটুও সময় নষ্ট করতে চাই না।"

"কিন্তু স্যার, আপনাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। আপনি ঐ জারোয়া-ল্যান্ডে যেতে পারবেন না। অর্ডার ছাড়া আমি কিছুতেই আপনাকে ওখানে যেতে দিতে পারি না।"

"অর্ডারটা দেবে কে?"

"পুলিশের এস পি সাহেবের কাছ থেকে অর্ডার আনতে

হবে। তাও তিনি পারমিশান দেবেন কিনা সন্দেহ। কয়েক-জন সাহেব ছবি তোলবার জন্য এসেছিল, তাও দেওয়া হয়নি।"

কাকাবাবু আর কোনো কথা না-বলে এই বোটে উঠে এলেন। ঐ বোটটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল, তারপর দুটোই চলল এক সঙ্গে।

তারপর জেটিতে পৌঁছে ওরা বোট থেকে নেমে জিপে উঠলেন, বেশ চওড়া বাঁধানো রাস্তা, দুপাশে বড় বড় গাছ, কিন্তু মানুষজন বা বাড়িঘর বিশেষ দেখাই যায় না। এটাও একটা দ্বীপের মধ্যে, কিন্তু দু' পাশের ঘন জঙ্গল দেখে সে-কথা আর মনে থাকে না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই রঙ্গতে পেঁছোনো গেল। দাশগুপ্ত বলেছিল, রঙ্গত বেশ বড় জায়গা। আসলে একটা ছোট গ্রামের চেয়েও ছোট। কয়েকটা দোকান, দু-তিনটে হোটেল আর কিছু বাড়িঘর। যে-কোনো বাড়ির পেছনেই নিবিড় বন।

রঙ্গতের ডাক-বাংলো একটা উঁচু পাহাড়ের ওপরে। রাস্তাটা এমন খাড়া যে, জিপটা ওঠবার সময় রীতিমতন গোঁগোঁ শব্দ করছে। যে-দিকে তাকানো যায়, শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।

বাংলোটা অবশ্য বেশ সুন্দর। দোতলা বাড়ি, বড় বড় কাচের জানলা, সামনে সুন্দর ছোট্ট একটা ফুলের বাগান। দোতলার জানলার সামনে দাঁড়ালে বহু দূর পর্যন্ত পাহাড় আর বন দেখা যায়—এখান থেকে আর সমুদ্র দেখা যায় না। এখানকার জঙ্গল এত ঘন যে আফ্রিকার কথা মনে পড়ে যায় —গল্পের বইতে যে-রকম জঙ্গলের কথা আমরা পড়েছি।

রান্না তৈরিই ছিল। ভাত, বড় বড় চিংড়ি মাছ ভাজা আর হরিণের মাংস। বাংলোর চৌকিদার খুব দুঃখ করে বলল, সে কিছুতেই পাঁঠার মাংস জোগাড় করতে পারেনি, তাই বাধ্য হয়ে হরিণের মাংস রেঁধেছে। সন্তু তো অবাক! পাঁঠার মাংস তো সে কতই খেয়েছে—কিন্তু হরিণের মাংস খাওয়াই দারুণ ব্যাপার। এখানে হরিণের মাংস খুবই শস্তা, এমন কী, এক-একদিন বিনা পয়সাতেও পাওয়া যায়। মাছ তো শস্তাই। এখানে সবচেয়ে দামী জিনিস তরকারি। অনেক লোক তিন-চার বছরের মধ্যে ফুলকপি চোখেই দেখেনি।

কাকাবাবু দারুণ গম্ভীর, কারুর সঙ্গে কোনো কথা বলছেন না। সন্তু কাকাবাবুর এই স্বভাবটা জানে। অনেক লোক শুধু নিজের বাড়ির লোকজন কিংবা টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তা করেন। কিন্তু কাকাবাবু এমন সব জিনিস নিয়ে চিন্তা করেন, যার সঙ্গে তাঁর নিজের কোনো সম্পর্কই নেই। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকরা এসে আন্দামানে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে, এজন্য কাকাবাবুর রাত্তিরে ঘুম হবে না কেন? কত লোক তো তবুও ঘুমোয়!

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সন্তু শুনতে পেল, কাকা-বাবু একা-একা বারান্দায় পারচারি করছেন। বারান্দাটা কাঠের। সেখানে কাকাবাবুর ক্রাচের শব্দ হচ্ছে ঠক্ ঠক্ ঠক্।

সকালবেলা দাশগুপ্ত বলল, "স্যার, জিপ রেডি! কখন বেরুবেন?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাব?"

"যেখানে আপনার খুশি। এখানে কত বেড়াবার জায়গা

শিশুদের—কিশোরদের—যত ছোটদের বই

বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের সবচেয়ে নামী ঘরানার এখনকার সব সেরা ধারক-বাহকের নাম। টুনটুনির বই, সন্দেশ, আবোল তাবোল, হযবরল-এর ঐতিহ্যে নতুন অথচ স্থায়ী সংযোজন তাঁর অবিস্মরণীয় ফেলুদা ও প্রোফেসর শঙ্কু। এদের কীর্তিকলাপ-কাণ্ডকারখানার দারুণ দারুণ কতকগুলি বই :

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫.০০
এক ডজন গপ্পো ৮.০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.০০
সোনার কেল্লা ৬.০০
বাক্স-রহস্য ৫.০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬.০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০
আরো এক ডজন ১০.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২.০০

সরলাবালা সরকার
পিন্‌কুর ডাইরি ২.০০

পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪.০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪.০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩.০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭.০০

শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩.০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪.০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬.০০
বাজনা ৫.০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫.০০
আমার নাম টায়রা ৫.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬.০০

নকুল মুখোপাধ্যায়
দেবতার পাহাড় ৩.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫.০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৪.৫০

পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫.০০
পাপুর বই ৬.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫.০০
পাথরের চোখ ৬.০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪.০০

ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৪.০০
সত্যি রাজপুত্র ৫.০০
তিন নম্বর চোখ ৫.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘন্টাদার কাবলু কাকা ৫.০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬.০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪.০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪.০০

মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪.০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫.০০

সুকুমার রায়
সমগ্র শিশু সাহিত্য ১০.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০.০০
জীবজন্তু ৮.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩.০০

গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩.০০

আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫.০০

বিমল কর
ওআণ্ডার মামা ৬.০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭.০০

মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪.০০

লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪.০০

অমরনাথ রায়
দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০.০০

আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪.০০

সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫.০০

অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩.০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ি ৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

আছে! চিত্রকূট যাবেন?"

"আমি এখানে বেড়াতে আসিনি, দাশগুপ্ত!"

চিত্রকূট নামটা শুনে সন্তুর খুব কৌতূহল হল। চিত্রকূট নামটা তো রামায়ণ বইতে আছে। এখানেও একটা চিত্রকূট আছে নাকি? জায়গাটা কেমন?

দাশগুপ্ত এক গাল হেসে বলল, "স্যার, কাজ তো আছেই! তবু এত দূর এসে একটু বেড়াবেন না? এখানে ভাল-ভাল জায়গা আছে। মায়াবন্দর যাবেন? চমৎকার জায়গা! আর যদি ডিগলিপুর যেতে চান, তাও ব্যবস্থা করা যায়। হরিণের পাল আর কুমির দেখতে হলে ডিগলিপুর যেতে হয়! যাবেন?"

সন্তুর কাছে মায়াবন্দর নামটাও খুব সুন্দর লাগল। সত্যিই এ-রকম নামের কোনো জায়গা আছে? জায়গাটা কি যখন-তখন বদলে যায়?

কাকাবাবু কড়া সুরে বললেন, "আমি কোথাও যেতে চাই না। আমি আজই ফিরে যেতে চাই।"

দাশগুপ্ত হতাশ ভাবে বলল, "আজই ফিরে যাবেন? একটা দিন থেকে গেলে হত না?"

"না! শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। এখানে আমাকে এনেছ কেন? আমি কি জায়গা দেখতে এসেছি? আজই ফিরে গিয়ে এস পি'র সঙ্গে দেখা করে অনুমতি নিয়ে নাও, যাতে আমি যে-কোনো জায়গায় যেতে পারি। এস পি যদি অনুমতি না দেন, তা হলে আমাকে দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে!"

দাশগুপ্তর নিজেরই আসলে খুব বেড়াবার ইচ্ছে। বোঝা যায়, লোকটি আসলে খুব বেড়াতে ভালোবাসে। তার মুখ দেখলে আরও বোঝা যায়, কাকাবাবুর কথা তার একটুও পছন্দ হয়নি। কাকাবাবুর দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠাবার কথা শুনে সে আরও ভয় পেয়েছে।

সকালবেলায় চা-জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়া হল। আবার জিপে করে সেই বন্দর পর্যন্ত যাওয়া। কাকাবাবু আগাগোড়া মুখ বুজে রইলেন। জেটিতে গিয়ে মোটরবোটে ওঠার সময় শুধু বোট-চালককে একবার প্রশ্ন করলেন, "ভাল করে তেল ভরে নেওয়া হয়েছে তো? আবার কোথাও এটা থেমে যাবে না?"

এই প্রথম শঙ্করনারায়ণকে হাসতে দেখল সন্তু। সে বলল, "না, স্যার, থামবে না। আশা করছি, ঘণ্টা চারেকের মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছে যাব।"

"ঠিক আছে, চলো!"

আশ্চর্যের ব্যাপার, মোটরবোটটা ছাড়বার পরই কাকাবাবু চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লেন। আসবার সময় তিনি চারদিক দেখতে-দেখতে আসছিলেন, কিন্তু এখন আর তাঁর কোনো আগ্রহই নেই।

সন্তু কিন্তু খুব আগ্রহের সঙ্গে চোখ মেলে রইল। এবার আর তার পেট ব্যথা হচ্ছে না কিংবা বমিও পাচ্ছে না। আসবার সময় সে শুধু ডান দিকটা দেখেছিল, এবার বসল বাঁ দিকে। যদি আবার কুমির কিংবা হাঙর দেখা যায়।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ওরা সেই জায়গাটায় এসে গেল, যেখানে জারোয়ারা থাকে। সেই বালির চড়াটাও দেখা গেল, যেটার নাম দাশগুপ্ত বলেছিল সোনা-বেলা। এখানকার বালিতে নাকি সোনা মিশে আছে।

ভুল হচ্ছে কিনা মিলিয়ে দেখবার জন্য সন্তু দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করল, "এইটা সেই জায়গা নয়? যেখানে কয়েকটা ছেলে নেমেছিল, আর জারোয়ারা হঠাৎ এসে আক্রমণ করল?"

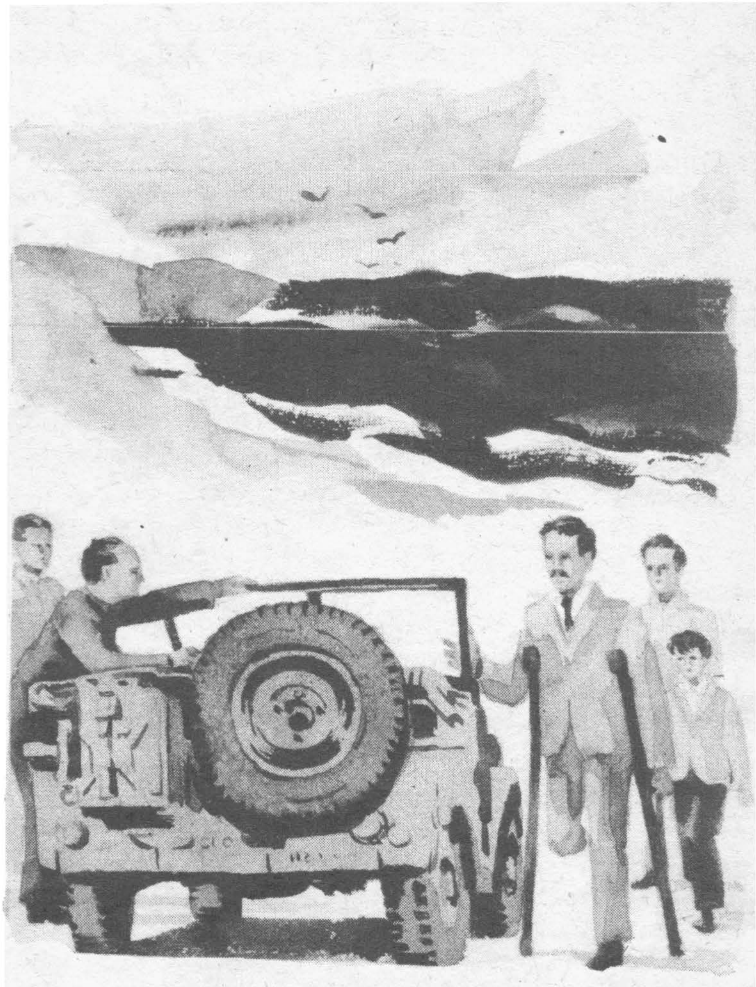

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ, ঠিক চিনেছ!"

তারপর দাশগুপ্ত ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে তখন আমি ঘটনাটা বললাম, আর তোমার কাকাবাবু বিশ্বাস করলেন না। উনি ভাবলেন আমি বানিয়ে বলেছি! আমি কিন্তু ঠিকই বলেছিলাম। জারোয়ারা এমন হিংস্র—"

কাকাবাবু এই সময় চোখ মেলে বললেন, "আমি এখনো তোমার কথা বিশ্বাস করি না!"

তার মানে কাকাবাবু সব শুনছিলেন? সজাগই ছিলেন উনি!

কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হুকুমের সুরে বললেন, "বোট ঘোরাও! আমি ওই বালির চরায় নামব!"

দাশগুপ্ত বলল, "সে কী? অসম্ভব! আপনাকে কিছুতেই নামতে দেব না, স্যার! আপনাকে বললাম না, অর্ডার ছাড়া এখানে নামা যায় না। আপনি কি প্রাণটা খোয়াতে চান?"

কাকাবাবু হঠাৎ এবার কোটের পকেট থেকে তাঁর রিভলবারটা বার করলেন। তারপর সেটা উঁচু করে তুলে বললেন, "আমি যা বলছি, তাই শুনতে হবে! বোট ঘোরাও!"

কাকাবাবু খট্ খট্ করে এসে শঙ্করনারায়ণের ঘাড়ের কাছে রিভলবারটা চেপে ধরে বললেন, "শঙ্করনারায়ণ, তুমি খুব ভাল ছেলে, আমার কথা শুনে চলো! নইলে, তোমাকে আহত করে আমি নিজেই বোট ঘোরাব!"

শঙ্করনারায়ণ একটাও কথা উচ্চারণ না করে খাঁড়ির ডান

দিকে মোটরবোট ঘোরাল।

সেটা বালির চরায় এসে থামবার পর কাকাবাবু নিজের ক্রাচ নিয়ে অতি কষ্টে নামলেন। হাতব্যাগটাও নিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "তোমরা সবাই ফিরে যাও! আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না।"

দাশগুপ্ত হাত জোড় করে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনি কেন এখানে যাচ্ছেন? আপনার রহস্য সমাধান করার জন্য এ ছাড়া আর কোনো জায়গা কি নেই?"

কাকাবাবু বললেন, "তার কারণ, অন্য সব জায়গায় গভর্নমেণ্টের লোকেরা কখনো-না-কখনো যায়। সেখানে অদ্ভুত কিছু থাকলে এতদিনে জানা যেত! শুধু এই জায়গাটাতেই আর কেউ আসে না। সুতরাং কিছু রহস্য থাকলে এখানেই আছে। তোমরা ফিরে যাও। এস-পিকে বলে কালকে কিছু লোকজন নিয়ে আবার ফিরে এসো আমার জন্য।"

তিনি এবার সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সন্তু, তুমিও যাও, পোর্ট ব্লেয়ারে আমার জন্য অপেক্ষা করো।"

দাশগুপ্ত বলল, "ওরে বাবা, যে-কোনো মুহূর্তে জারোয়ারা তীর মারতে পারে।"

কাকাবাবু রিভলবারটা উঁচু করে বললেন, "তোমাদের আর তো থাকবার দরকার নেই। তোমরা যাও!"

সঙ্গে-সঙ্গে মোটরবোটটা চলতে শুরু করল।

কিন্তু সন্তু কিছুতেই কাকাবাবুকে ছেড়ে যাবে না। সে মোটরবোট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

(ক্রমশ)

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার ॥ আঞ্চলিক প্রতিনিধি ও মণিমেলাগুলির সক্রিয় সহায়তায় ১ আগস্ট পদ্মরাগ, মরকত ও নীলা-মণিপ্রতীকের সমস্ত বিষয়গুলির এবং হীরক-মণিপ্রতীকের কেবলমাত্র লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা সারা দেশে সকল অঞ্চলে একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই বছরে দু'হাজারের কিছু বেশী মণিভাইবোন প্রতীক পরীক্ষা দিয়েছে। হীরক-মণিপ্রতীকের লিখিত পরীক্ষায় যে-সব ভাইবোন উত্তীর্ণ হবে, তাদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা আগামী ১০ ও ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। সংঘসহায়ক কর্মীদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা মণিমেলার বার্ষিক আবাসিক শিক্ষণ-শিবিরে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে। অবশ্য এই পরীক্ষা কেবলমাত্র শিবিরে যোগদানকারী কর্মী ভাইবোনেরাই দিতে পারবে।

মণি সন্দেশ ॥ বার্নপুরের আনন্দ মণিমেলার একাদশ বার্ষিক উৎসব ৩ থেকে ৫ জুন সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হ'ল। মণিভাইবোনেরা ক্রীড়াঙ্গনে ও মঞ্চে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

মধ্যমগ্রামের জীবনদীপ মণিমেলার চতুর্থ বার্ষিক উৎসব ১২ থেকে ১৪ জুন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মাঠের অনুষ্ঠান ছাড়াও 'মহেশ' নাটক এবং 'অ, আ-র দেশে চলো' নৃত্যনাট্য সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টের রবীন্দ্রনগর মণিমেলা 'বন্দেমাতরম' সংগীতের শতবর্ষপূর্তি উৎসব ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-জয়ন্তী পালন করল গত ২৬ ও ২৭ জুন। এই উপলক্ষে স্বদেশী গানের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২৪ পরগনার জগদ্দলের নবমিতালী মণিমেলা সম্প্রতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ২৮ জুন 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ১ জুলাই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মোৎসব উদযাপিত হল। ৪ জুলাই মণিভাইবোনেদের 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি সুভাষ মণিমেলা ১৪ জুন রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব পালন করল। অনুষ্ঠানে মণিভাইবোনেরা এই দুই কবির জীবনী আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি ও গানে অংশ গ্রহণ করে।

২৪ পরগনার গড়িফার রুস্টার মণিমেলা সম্প্রতি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'শরৎচন্দ্র ও গ্রাম বাংলা' বিষয়ে এক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এছাড়াও ১০ জুন রবীন্দ্র-জন্মোৎসব, মণিপ্রতীক বিতরণ ও নতুন পাঠাগারের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

রিষড়ার শিশুমৈত্রী মণিমেলা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্প্রতি ড্রিল, ছবি আঁকা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল।

হুগলীর আরামবাগ বিবেকানন্দ মণিমেলার সপ্তম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সারা বছর ধরে বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য মণিভাইবোনেদের এইদিন পুরস্কৃত করা হয়।

গার্ডেনরীচের আদর্শ মণিমেলা স্থানীয় এক ড্রিল প্রতি-যোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে।

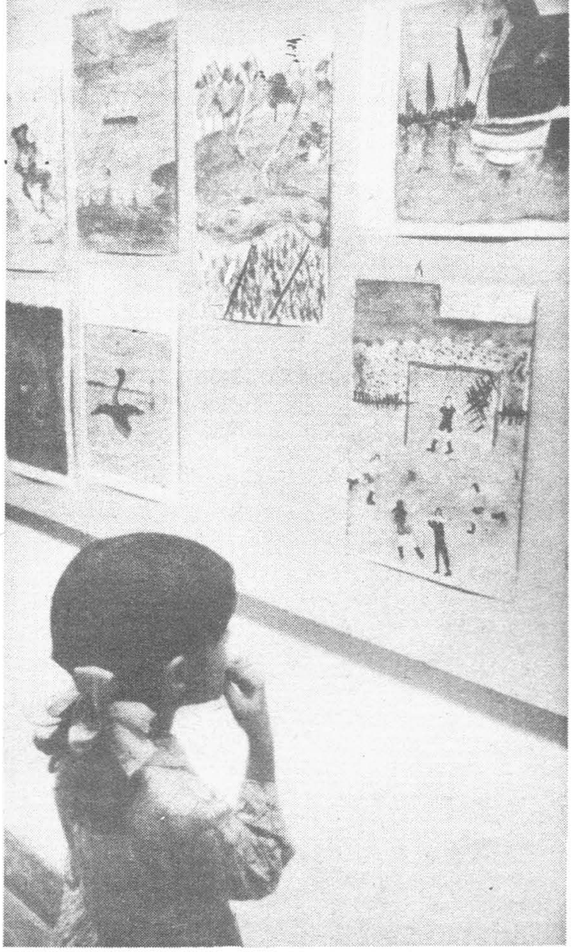

ছোটদের ছবি

নানা রংয়ের অদ্ভুত একটা বাড়ি, তার ঠিক ওপরে আরও অদ্ভুত একটা রাস্তা, সেই রাস্তার মাথার দিকে শুয়ে আছে কিম্ভূত একটা লোক। কিংবা ছয় বেহারার কাঁধে রঙিন পাল্কি, আর আকাশে উঠে ঢোল বাজাচ্ছে দুজন। অথবা একটা লোক বাঁকে করে পাখির খাঁচা নিয়ে যাচ্ছে একগাদা, কিন্তু খাঁচাগুলো কীভাবে আটকে আছে বোঝা অসম্ভব। এমন-সব অসম্ভব ছবি গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটার পরে একটা। এদের দিকে একটানা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হবে পায়ের তলার মাটি মিথ্যে, সামনের ওই দেয়াল মিথ্যে, দেয়ালের ওপরের ছাত মিথ্যে। সত্যি শুধু ওই অসম্ভব ছবিগুলো, সত্যি শুধু ওই অদ্ভুত রাস্তা, আকাশচারী ঢোলবাদক আর বিচিত্র সব মানুষজন। শিশুর জগৎ শিশুরাই তৈরি করতে পারে। এদের হাতের রং আর তুলি বড়দের ব্যাকরণের ধার ধারে না। সম্প্রতি ছোটদের আঁকা শ' দেড়েক ছবির একটি চমৎকার প্রদর্শনী হয়ে গেল আকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এ। ছবিগুলি "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতা থেকে বাছাই-করা। শুধু ছবিই নয়, "বসে লেখো" প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাও হয়েছিল। এ-সবের উদ্যোক্তা ছিল বাটা। উপলক্ষ টমাস বাটার জন্মশতবার্ষিকী। পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৩ আগস্ট আকাদেমি ভবনে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "এই ধরনের প্রতিযোগিতা শিশু-প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করে। শিশুরাই শিশুদের ছবির আসল বিচারক।" শ্রীমতী নলিনী দাশ বলেন, "প্রবন্ধগুলিও বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে।" শ্রীমতী দাশ প্রবন্ধ বিচারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে মোট ৪২ জন। এদের বয়েস চার থেকে পনেরোর মধ্যে। কয়েকজন পুরস্কার-বিজয়ী মাথায় এত ছোট ছিল যে, চেয়ারের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। একটু পেছনে যারা বসেছিলেন দেখতেই পাচ্ছিলেন না। পুরস্কার পাওয়া আনন্দের, কিন্তু পুরস্কার দেওয়া এবং সে-দৃশ্য দেখাও যে সমান আনন্দের—এই অনুষ্ঠানটি ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ডোডো তাতাই

লেখা | তারাপদ রায়
রেখা | কৃত্তিবাস রায়

পুজোর ছুটি প্রায় এসে গেছে। ডোডোবাবু তাতাই-বাবু সিঁড়ির উপরে বসে আকাশের মেঘপাখি এই সব দেখছেন।

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে তাতাইবাবু বললেন, "দিন কী তাড়াতাড়ি যায়, আবার পুজো এসে গেল।" তারপর একটু থেমে কী ভেবে নিয়ে বললেন, "বয়েস কী তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে, এই তো গতবারই দশ ছিল, চোখের সামনে দেখতে-দেখতে এগারো হয়ে গেল, একেবারে সত্যি বড় হয়ে গেলাম।" ডোডোবাবু এতটা দার্শনিক প্রকৃতির নন, তাঁর বয়েসও একটু কমই, তিনি হালকা হেসে বললেন, "হ্যাঁ, দৈনিক একদিন করে বয়েস বাড়ছে, আপনার, আমার, কুকুরগুলোর পর্যন্ত।" এই শুনে তাতাইবাবু একবার কটমট করে তাকাতেই ডোডো-বাবু অন্তর্হিত হলেন।

তাতাইবাবু ঘরে ফিরে এসে ডোডোবাবুকে জব্দ করার জন্য একটা ফন্দি খাটাতে লাগলেন। শেষে বারান্দার একপাশে একটা পুরনো পাখির খাঁচা জঞ্জালের মধ্যে পড়ে ছিল, সেটা ঝেড়েঝুড়ে বাইরের ঘরে এনে ঝুলিয়ে একটা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিলেন।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেরি হল না, বিকেলে ঘরে ঢুকেই ডোডোবাবুর চোখে পড়ল ঢাকা খাঁচাটা। "ওটা-কী?" বলেই তিনি ঢাকনাটা তুলতে গেলেন, তাতাইবাবু তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন, "আরে ও কাজ করবেন না, বাচ্চা ময়ূর চোখে আলো লাগলে ভয় পাবে।" ডোডোবাবু অবাক, "বাচ্চা ময়ূর! ময়ূর পুষলেন নাকি?" তাতাইবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "উপায় ছিল না।" ডোডোবাবু আরও অবাক, "কেন?" তাতাইবাবু উত্তর দিলেন, "আর বলবেন না, গত দুদিন পরপর স্বপ্ন দেখলাম ঘরের মধ্যে কয়েকটা ছোটবড় সাপ কিলবিল করছে। তাই ময়ূরের বাচ্চাটা নিয়ে এলাম, দেখি সাপেরা যায় কিনা।" ডোডো-বাবু এবার স্তম্ভিত, "সে কী মশায়, সাপগুলো তো সত্যি নয়, স্বপ্নে দেখেছেন।" তাতাইবাবু বললেন, "ময়ূরটাও সত্যি নয়, খাঁচাটা ফাঁকা। বিশ্বাস না হয় ঢাকনাটা একবার তুলে দেখুন।"

শিবুর আঙুল / জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

মনে আছে একদিন শিবু ক্লাসে এসে সবাইকে বলল, "জানিস, কালকে ম্যাচ খেলতে গিয়ে আমার একটা আঙুল কেটে গেছে।" দেখলাম, তার বাঁ হাতে এক বিরাট ব্যান্ডেজ। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "আঙুল কেটে গেছে তো এতবড় ব্যান্ডেজ কেন? শিবু একবার উদাসভাবে আমাদের দিকে তাকাল, তারপর মাথা নিচু করে বলল, "এ-কাটা যে-সে কাটা নয়। একটা আঙুল পুরো কেটে বাদ হয়ে গেছে।" আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। গতকাল এতবড় একটা ব্যাপারের পর ও আজকে স্কুলে এল কী করে? এটা নিশ্চয়ই ওর চিরাচরিত ব্যাপার অর্থাৎ বেমালুম মিথ্যে কথা বলা। জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপারটা কোথায় হয়েছে?" ও বলল, "গতকাল যাদবপুরে ম্যাচ খেলবার সময় প্রতিপক্ষের একজন একটা মারাত্মক 'ফাউল' করেছিল।" শিবু ছিল গোল-কিপার, একেবারে 'লাইফ রিস্ক' করে বল ধরেছে—তক্ষুনি প্রতিপক্ষের সেই ষণ্ডা মার্কা ছেলেটা বল সমেত ওর হাতেই সজোরে কিক মারে। বলটা তার হাত থেকে ফসকায়নি, তবে বুটের ঠোক্করে একটা আঙুল উড়ে গেছে। সবাই জিজ্ঞেস করল, "আঙুলটা নেই?" ও বলল, "সবাই খোঁজাখুঁজি করছে, পাওয়া গেলে তো ভাল কথা, অপারেশন করে একটা কিছু করা যেত। কিন্তু এখনও পাওয়া যায়নি।" শিবুর এই অহেতুক মিথ্যা কথায় আমার হাড় পিত্তি জ্বলে গেল। ওকে শিক্ষা দিতেই হবে। না চটে গম্ভীর হয়ে বললাম, "আমার বাড়িতে একটা আঙুল আছে, তুমি যদি চাও দিতে পারি।" শিবু তো ফায়ার। বলল, "প্রদীপ,

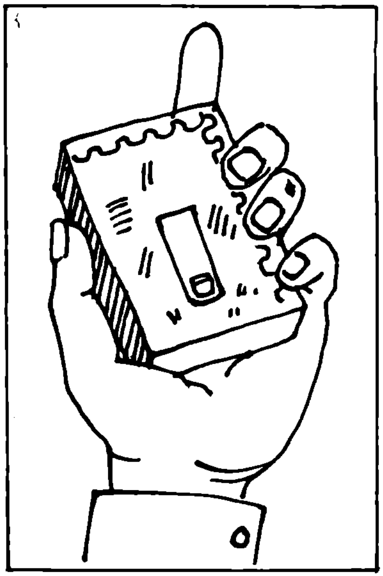

তুমি এই বিপদের সময়ে আমার সংগে ইয়ারকি করছ?" ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরাও দেখলাম আমার ওপর বেশ চটে গেল। আমি সেজন্য আর কথা না-বাড়িয়ে বললাম, "ঠিক আছে, ছুটির পর বাড়িতে এসো, দেখাব।"

শিবু দমবার ছেলে নয়। সক্কলের সামনে ও বড় বড় লেকচার দিতে আরম্ভ করল, ফলে ব্যাপারটা এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাস হয়ে স্কুলময় ছড়িয়ে গেল এবং ছুটির সময় দেখা গেল প্রচুর ছাত্র আমাদের সংগে বাড়িতে হাজির হয়েছে।

আমি বাড়ির ভেতর থেকে একটা সিগারেটের বাক্স নিয়ে এসে বললাম, "আঙুলটা এতে আছে, কিন্তু বেশী হাওয়া লাগানো ঠিক নয়, আমি একবার দেখিয়েই রেখে দেব। অবশ্য শিবু যদি চায় দিয়ে দিতে পারি।" বলে আমি সিগারেটের বাক্সটা আস্তে খুললাম। ভেতরে ভর্তি তুলো, আর সেই তুলো একটু ফাঁক করতেই দেখা গেল রক্তমাখা একটা আঙুল। শিবুকে বললাম, আঙুলটা ছুঁয়ে দেখতে সত্যি মানুষের আঙুল কিনা। শিবু কাঁপা-কাঁপা হাতে একটু ছুঁয়ে বলল, "হ্যাঁ, সত্যিকারের আঙুল।" সব্বাই চুপ। এবারে আমার লেকচার দেবার পালা। বাক্সটাকে বন্ধ করতে করতে বললাম, "তোমরা ভেবেছিলে আমি মিথ্যে কথা বলছি। কী করে তোমরা ভাবলে? যাই হোক শিবুর যদি প্রয়োজন হয় আঙুলটা নিতে পারে।" সবাই শিবুর দিকে তাকিয়ে রইল। শিবু একটু আমতা-আমতা করে বলল, "না না, অন্যের আঙুল নিয়ে আমি কী করব? হয়তো এতক্ষণে আমার নিজের আঙুলটাই খুঁজে পাওয়া গেছে।"

শিবু যে মিথ্যে কথা বলছিল, সে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। কিন্তু আমি আঙুল পেলাম কোত্থেকে? আসলে এটা একটা ম্যাজিক। ঐ কাটা আঙুলটা আমারই হাতের একটা আঙুল। বাক্সের তলায় একটা ফুটো ছিল আর সেই ফুটো দিয়ে আমার হাতের একটা আঙুল গলানো ছিল। আর ভেতরের তুলোতে একটু একটু লাল রং লাগানো ছিল। সেইজন্য দেখে মনে হয় রক্তমাখা একটা আঙুলের টুকরো বাক্সের ভেতরে রয়েছে। ছবি দেখলেই ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারবে।

দুটি ছড়া
বিজয়া মুখোপাধ্যায়

হার মানা তার মানা
সকল বিদ্যে জানা
পরীক্ষা দাও — বললে করে
নানান্ টালবাহানা।

নেই নাকি তার ফাঁকি
বাস করে সেই টাকি
ভাড়ার টাকা চাইলে বলে
থাক না ওটা বাকি।

২

বাচ্চু না তো, বিচ্ছু
ক্রকারি সেট ভেঙে বলে
'করব না আর কিচ্ছু।'
বলেই গেল মাঠে
বল হাতে সে ছুটু লাগাল
স্পিন বোলারের ঠাটে।
ফিরল যখন বাড়ি
হাঁটুর ওপর পট্টি বাঁধা
চাঁদপানা মুখ হাঁড়ি—
'বাদবাকিটা কাল
আর কী বাকি, বলব নাকি
করব নাজেহাল।

খেলায় মজা

দিলীপ দত্ত

নিজের সেণ্টার থেকে গোল

সেণ্টার থেকে হেড করে গোল করা আমরা দেখেছি। কিন্তু নিজেই সেণ্টার করে সেই সেণ্টার থেকে গোল করা কেউ দেখেছ কি?

এইরকম ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭৪ সালে ইংলণ্ডে ব্লাকবার্ন রোভার্স এবং সাণ্ডারল্যাণ্ডের লীগ খেলায়।

ব্লাকবার্নের রাইট ইন ডেভিড শীয়া পেনাল্টি সীমানার ডানদিক থেকে একটি বল খুব উঁচু করে গোলের সামনে সেণ্টার করলেন, তারপর নিজেই দৌড়ে গিয়ে সেই বলটি হেড করে গোল করলেন।

* * *

সেমসাইড

যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম এফ-এ কাপ ফাইনাল। ডার্বি কাউন্টি খেলছেন অ্যাশটন ভিলার বিরুদ্ধে। নির্ধারিত ৯০ মিনিট খেলার পর ফলাফল দাঁড়াল ১-১। গোল দুটি করেছিলেন একই খেলোয়াড়, চার্লটনের রাইট হাফব্যাক বার্ট টার্নার।

দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের একটি শট আটকাতে গিয়ে নিজের গোলেই বল ঢুকিয়ে দেন। এক মিনিট পরেই একটি ফ্রি কিক থেকে নিজের দেওয়া গোলটি পরিশোধ করেন।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমার এক বন্ধু খেলোয়াড়কে দেখলাম খেলার মাঠ থেকে বুট হাতে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, খেলার কী রেজাল্ট?" সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "আমরা দিয়েছি তিন গোল, আর ওরা দিয়েছে এক গোল।" বললাম, "তাহলে তো জিতেছিস, পালাচ্ছিস কেন?" বন্ধু বলল, "না, আমরা তিনটে সেম্‌সাইড গোল করেছি, আর ওরা দিয়েছে একটা গোল। মোট চার গোলে হেরেছি, তাই সাপোর্টাররা তাড়া করেছে।"

* * *

হেড্ বটে!

ইংলণ্ডের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগে ডিক্সি ডীন এক মরশুমে ৬০টি গোল করে রেকর্ড করেছিলেন। হেড্ করায় ডীন ছিলেন খুব দক্ষ।

গোলের সামনে মাথার কাছে বল পেলে আর রক্ষে নেই! মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে এমন হেড্ করতেন যে, যে-কোনো গোলরক্ষকের পক্ষে তা আটকানো অসম্ভব ছিল।

একটা গল্প আছে। লিভারপুলের বিখ্যাত গোলরক্ষক এলিসা স্কট একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় ডিক্সি ডীনের সঙ্গে তার দেখা হল। ডীন তাঁকে মাথা নেড়ে ডাকলেন। ডীনের মাথা ঝাঁকুনি দেখেই বল আটকানোর ভঙ্গীতে স্কট ডাইভ দিয়ে পড়লেন ফুটপাথের ওপর।

আরও দুটি

অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিয়ে আয় কম্বল,
আর মিঠে অম্বল,
শুনে যা শুনে যা ওরে ভোম্বল রে।

খেতে ভালবাসি দই,
কাঁকড়া-ইলিশ-কই,
পেতে রাখ্ পেতে রাখ দম্বল রে।

নিয়ে আয় মুড়কি,
ওটা আমচুর কি,
রেখে দিই কালকের সম্বল রে।

খিদে পেয়ে গেছে খুব,
যাই দিয়ে আসি ডুব,
কাজ কর্, বাজে কথা কম বল্ রে।

২

সরোজ জেঠুর গরজ যে নেই
গৌরী জেঠির মৌরি
আনতে গিয়ে এলেন ঘুরে বোম্বাই মুসৌরি।

এমনি অনেক কাণ্ড তিনি মাঝে মাঝেই করেন,
বললে কিছু রেগে ওঠেন, বলেন, যাবো ফরেন,

হাতে আমার অনেক ছুটি,
কেবল খাবো কড়াইশুঁটি,
শীতকে আমি থোরাই ডরাই—সঙ্গে যাবে নরেন।

ডাইনোসর-চুরি

সাউথমেয়ারের সঙ্গে মহিলারাও একই কুঠুরিতে বন্দী!
বটে!
মাস্টার এডওয়ার্ড! আমরা যখন ডাইনোসরটার ভিতরে লুকোনো মাইক্রোফিল্মটা খুঁজছিলাম, তখন ধরা পড়ি!
কোথায় লুকিয়েছিলে, মনে পড়ে?
মাথার সেই আঘাতটা! কিচ্ছু মনে পড়ছে না!
হোয়ান লিঙ মুক্তা-সংগ্রহ নিয়ে এসেছে এই ভাঁওতা দিয়ে নুপ ওয়ান জাদুঘরের নৈশ পাহারাদারদের দরজা খুলে দিতে বলেছে...
এটা ঠিক হচ্ছে না, তবে কিনা?
দরজা খোলবামাত্রই প্যাঁচ মেরে ওরা ঢুকে পড়ল...
চটপট জাদুঘরটি দখল করে নিল তারা...
ডাইনোসরটাকে খোঁজো! শিগগির!
ইতিমধ্যে চোরকুঠুরিতে ... পাহারাদারকে কথায় ভুলিয়ে হোটি দরজা খুলিয়েছেন
পাজী কোথাকার!
মনে পড়েছে! আমার মনে পড়েছে!
ডাইনোসরটার গর্দানের হাড়ে মাইক্রোফিল্ম লুকিয়ে রেখেছিলাম!
গর্দানের হাড়ে!

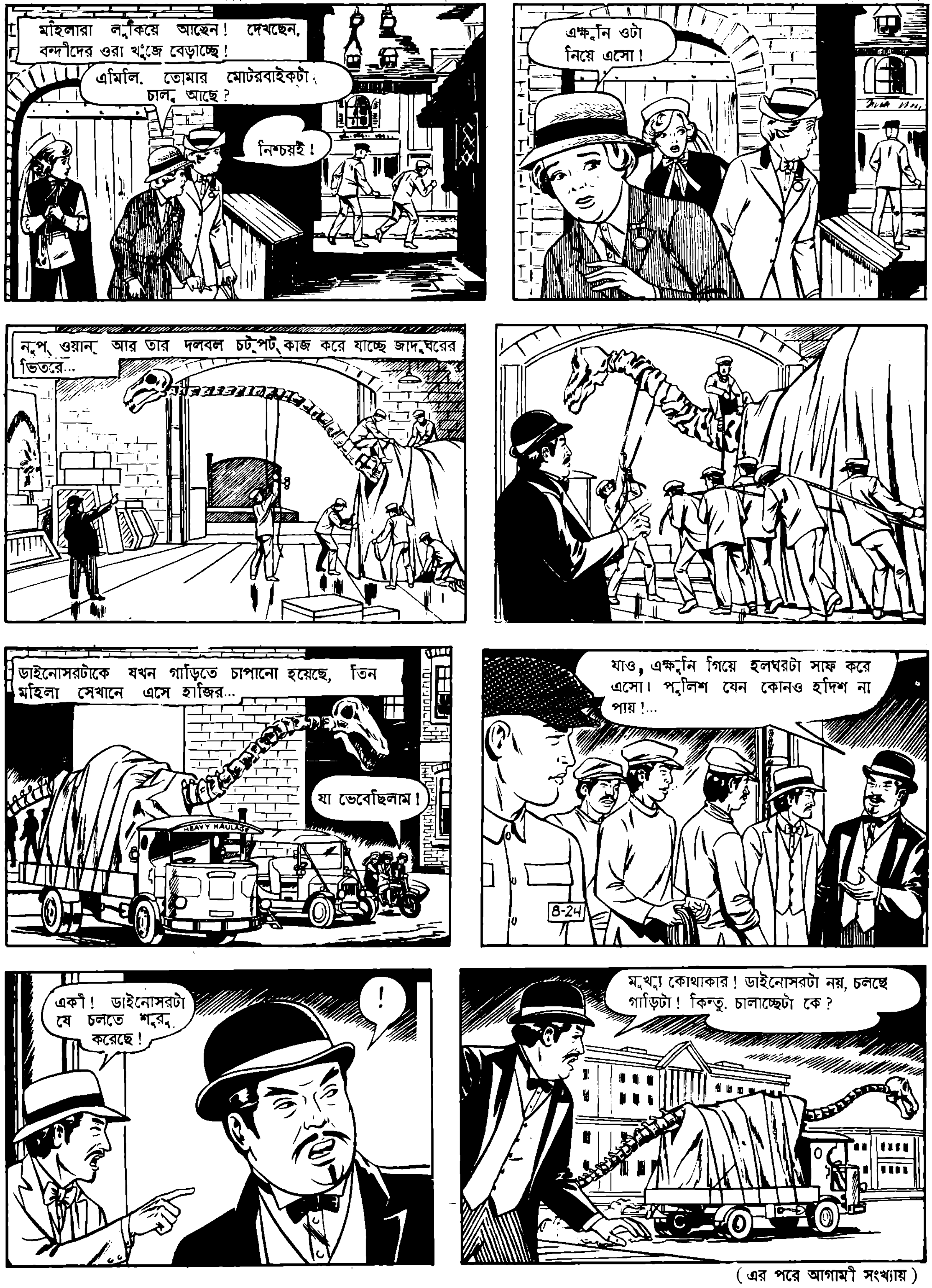

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

নিবেদিতা স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন

"দরকার হল, প্রথমেই ভয় ভাঙানো। লেখাপড়াটা যে একটা ভয়ানক কিছু নয়, সেটা ছেলেমেয়েদের বোঝা দরকার। ---নোটবই দিয়ে কী হবে? নোটবই শুধু উপকার করে না তা নয়, অপকার করে। সত্যিকার উপকার হয় যদি বারবার টেক্স্‌ট বই পড়া যায়। ভালো ভালো লেখকের কিছু-কিছু বাইরের বই পড়া-ও একটা ভালো অভ্যেস। --- আপনাদের মাসিক আনন্দমেলা দেখেছি সব মেয়েই খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে।"

একবার চোখ বুজে কল্পনা করো, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে সিসটার নিবেদিতা একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর সেই স্কুল উদ্বোধন করছেন জননী সারদা দেবী, স্বয়ং বিবেকানন্দ সেখানে উপস্থিত। এটা কিন্তু সত্যিই কোনও কল্পনা নয়, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিসটার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের ইতিহাস। তেমনই এখানকার পরিবেশ আর লেখাপড়ার উঁচু মান। প্রতি বছর এই স্কুলের অনেক মেয়ে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পায়। পর্ষতের পরীক্ষায় বেশির ভাগ মেয়েই ফার্স্ট ডিভিশনে ও বাকীরা হাই সেকেনড ডিভিশনে পাশ করে। মাঝেমাঝেই প্রথম দশ জনের মধ্যে কয়েকজন জায়গা করে নেয়।

প্রধান শিক্ষিকা প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি স্কুলের সুনাম ও সুন্দর পরিবেশের কারণ খানিকটা বুঝতে পারি। কিন্তু তাই বলে স্কুলের সব ছাত্রীই লেখাপড়ায় ভালো, এটা কী করে হয়? আমি প্রশ্ন করলাম, "এখানে আপনারা কীভাবে পড়ান?"

সন্ন্যাসিনী প্রধান শিক্ষিকা বললেন, "রোজকার পড়াটা ভালো করে পড়া ও বুঝে নেয়ার দিকে আমরা জোর দিই। এটাই তো আসল দরকার। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে মেয়েরা যাতে খুশিমতো বই নিয়ে পড়ে সেদিকেও আমরা নজর রাখি। পরীক্ষার দিকে চোখ রেখে কিছু-কিছু চ্যাপটার বেছে নিয়ে, কিছু ছাত্রী বাছাই করে ভালো রেজাল্ট করাবার জন্যে তাদের প্রস্তুত করা আমার মতে ভুল পদ্ধতি। সব ছাত্রীই যাতে লেখাপড়াটা সহজ-ভাবে নিতে পারে ও রোজকার পড়াটা ঠিক মতো করতে পারে— আমাদের শিক্ষিকারা সেটাই খুব যত্ন নিয়ে দেখেন। এভাবে পড়ানোর ফলে মেয়েদের ওপর কখনও খুব বেশী পড়ার চাপ পড়ে না, তারা দিনে-দিনে আপনা থেকেই তৈরী হয়ে যায়। দক্ষিণ কলকাতায় যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের মা-বাবারা তাদের লেখা-পড়া নিয়ে মাথা ঘামান, বাড়িতে তদারক করেন, এখানে সেটা তত দেখবেন না। এটা বোধহয় উত্তর কলকাতার একটা বৈশিষ্ট্য। আমাদের ছাত্রীদের যা-কিছু লেখাপড়া, সব স্কুলেই। শিক্ষিকা-রাই সব বুঝিয়ে দেন। অনেক বাড়িতে সেরকম পরিবেশই নেই। এই সব মেয়েদের অনেকে গরিব, কিন্তু উত্তর কলকাতার সংস্কৃতি-মান, বনেদী পরিবারের মেয়ে। ভারি ভদ্র ও শান্ত।"

আমি বললাম, "কিন্তু লেখাপড়ায় কিছুটা কাঁচা—এরকম মেয়েও তো থাকে, আপনাদের স্কুলেও নিশ্চয় আছে, তারাও কীভাবে ভালো ছাত্রী হয়ে ওঠে?"

প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা বললেন, "আমরা তাদের প্রয়োজন-মতো বিশেষ কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করি। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই তারা নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে ভালো ছাত্রীদের ধরে ফেলতে পারে। নিজেরাও ভালো ছাত্রী হয়ে ওঠে।"

পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর কথা আমার মনে ছিল, সেই দিকে খেয়াল রেখে আমি প্রশ্ন করলাম, "লেখাপড়ায় ভালো হতে গেলে কী করা উচিত?"

প্রধান শিক্ষিকা মৃদু হেসে বললেন, "কম পড়া উচিত। দিনরাত পড়াশুনোর চাপের মধ্যে থেকে উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার বদলে খেলাধুলো করে, খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে, স্বাস্থ্য ভালো রেখে মনের খুশিতে অল্প অল্প পড়া উচিত। দরকার রোজকার পড়া রোজ পড়ে ফেলা। ব্যস, তারপর ছুটি।"

শুনে আমার মন নেচে উঠল, যেন আমিই এক বিপন্ন ছাত্র। আরও সাহস পাবার আশায় আমি প্রশ্ন করলাম, "একটু-পিছিয়ে-পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রাখা কি দরকার? বা, নোটবই?"

"দরকার হল, প্রথমেই ভয় ভাঙানো। লেখাপড়াটা যে একটা ভয়ানক কিছু নয় সেটা ছেলেমেয়েদের বোঝা দরকার। প্রাইভেট টিউটর বা নোটবই দিয়ে কী হবে? নোটবই শুধু উপকার করে না তা নয়, অপকার করে। সত্যিকার উপকার হয় যদি বার-বার টেক্স্‌ট বই পড়া যায়। ভালো ভালো লেখকের কিছু কিছু বাইরের বই পড়া-ও একটা ভালো অভ্যেস। আমাদের লাইব্রেরিতে বই ছাড়াও ছোটদের অনেক পত্রিকা রাখি। আপনাদের মাসিক আনন্দমেলা দেখেছি সব মেয়েই খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে। এই যে মনের খুশিতে আগ্রহ নিয়ে পড়া, এটা খুব বড় জিনিস। পরীক্ষার পড়াশুনোর অত্যধিক চাপে, উদ্বেগে সেটা নষ্ট হতে দেয়া উচিত নয়। পড়বার আগ্রহই যদি চলে যায় তাহলে আর রইল কী? সেটা থাকলে, বইয়ে কী লেখা আছে সে তো পড়লেই জানা হয়ে যাবে। পরীক্ষায় বসে প্রশ্নের উত্তর লিখতেই বা তখন ভয় কিসের? মনের খুশি নিয়ে কম পড়াই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মতন পড়া।"

আমি বললাম, "যে-কোনও একটা বিষয় ধরা যাক, যেমন ইতিহাস। কীভাবে পড়া উচিত?"

প্রধান শিক্ষিকা ইতিহাসের শিক্ষিকা শ্রীমতী মালবিকা

ঘোষকে ডেকে পাঠালেন। আমার প্রশ্নটা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন।

শ্রীমতী মালবিকা ঘোষ বললেন, "ধরুন কেউ সমুদ্রগুপ্ত পড়ছে। সমুদ্রগুপ্ত কোথায় কোথায় রাজ্য বিস্তার করেছিলেন সেটা একটা ম্যাপে ধরে রাখলে মনে রাখবার সুবিধে। সেই সব জায়গাগুলোর এখন কী নাম, সেগুলো এখন কোন্ কোন্ রাজ্যে পড়েছে, এইসবও তাদের চোখের সামনে থাকা দরকার। পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজ—আমাদের দেশের এইসব বড় বড় ঘটনা নানারকম ম্যাপ, চার্ট ও মডেলের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে তোলা দরকার। আবার ধরুন কেউ সিন্ধু সভ্যতা পড়ছে। ওই সময়কার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যা খুঁড়ে পাওয়া গেছে, সেগুলো ছবি সমেত একটা তালিকা করে নিলে ব্যাপারটা জীবন্ত হয়ে ওঠে।"

অঙ্কের ব্যাপারে জানতে চাইলে গণিত-শিক্ষিকা শ্রীমতী আশা পাল বললেন, "অঙ্ক অনেকেই খুব দ্রুত বুঝে নেয়। কিন্তু প্রচুর প্র্যাকটিস করা সবচেয়ে বেশী দরকার। না হলে অনেক ছোট-খাট ভুলের ফলে কিছুই লাভ হয় না। খুব বেশী প্র্যাকটিস করলে অনেক সাধারণ ছেলেমেয়েও অঙ্কে ভালো নম্বর পেতে পারে।"

"আপনাদের হোম সায়েনস-এর তো খুব সুনাম। কী করে সেটা সম্ভব হল?"

ওই বিষয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী প্রীতি মজুমদার বললেন, "বেটার হোমস, মডারন হোম লনড্রি ওয়ারক—এই ধরনের কিছু কিছু ভালো বই আমরা ছাত্রীদের পড়াতাম। তখন এই সাবজেক্ট-এ ৬০০ নম্বর ছিল। এখন তো এটা ১০০ নম্বরের অ্যাডিশানাল সাবজেক্ট।"

সবশেষে প্রধান শিক্ষিকা বললেন, "আরেকটা ছোট্ট কথা বলতে চাই। কথাটা ছোট্ট কিন্তু ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়। সেটা হল, বানান ও হাতের লেখা। বানান নির্ভুল ও হাতের লেখা সুন্দর করার চেষ্টা কিন্তু সব ছাত্র-ছাত্রীরই করা উচিত। এতে লেখা-পড়ায় তাদের ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। হাতের লেখা সুন্দর করাও যে একটা দরকারী কাজ, সেটা কিন্তু আজকালকার ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই মনে রাখে না।"

কীভাবে তৈরী হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিসটার নিবেদিতা গার্লস' স্কুলের ক্লাস টেন-এর ছাত্রী সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায় সেভেন থেকে এইট-এ উঠেছে সেকেনড হয়ে। এইট থেকে নাইন-এ ওঠবার সময়ও তা-ই। আর নাইন থেকে টেন-এ? ফার্স্ট। সুপ্রীতির বয়েস পনের, থাকে বাগবাজারের গোঁসাই লেন-এ। সামনের বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। কীভাবে তৈরী হচ্ছে তাই নিয়ে আমি সুপ্রীতিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করি, সেও পর-পর উত্তর দিয়ে যায়।

প্রশ্ন : বাড়িতে তোমাকে কে সাহায্য করেন?

উত্তর : বাড়িতে আমার কোনও গাইড নেই। বাবা অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন। মা তো আগেকার দিনের মেয়ে, বাড়িতে পড়াশুনো করেছেন। স্কুলের দিদিরাই আমাকে সাহায্য করেন।

প্রশ্ন : বাড়িতে কতক্ষণ পড়ো?

উত্তর : কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম করে পড়ি না। একটানা খুব বেশীক্ষণ পড়তে পারি না। যখন ইচ্ছে হয় পড়ি। সকালে সাড়ে সাতটা থেকে ন-টা, আর রাত্তিরে বেশির ভাগ দিন খেয়ে-দেয়ে উঠে রাত নটা-দশটায় সব যখন নিরিবিলি হয়ে যায় তখন পড়তে বসি—দু-এক ঘণ্টা পড়ি। সন্ধেবেলা বসলেও পড়ায় মন দিতে পারি না। আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে আসেন। ওই ঘরের মধ্যেই তাঁরা কথাবার্তা বলেন। অবশ্য পরীক্ষার দিনগুলোয় লোকজন এলেও সন্ধে থেকে জোর করে পড়ি।

প্রশ্ন : মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে কীভাবে তৈরী হচ্ছ?

উত্তর : রোজকার ক্লাসের পড়া রোজ তৈরি করি। তাছাড়া টেক্‌সট্ বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছি। টেস্‌ট পেপার থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখছি, অঙ্ক করছি, আর অবজেকটিভ প্রশ্নগুলোর উত্তর মনে মনে সাজাচ্ছি।

প্রশ্ন : কোন কোন বিষয়ে তুমি জোর দিচ্ছ?

উত্তর : এখন বেশী জোর দিচ্ছি সায়েনস-এ। গত বছর অঙ্ক, সায়েনস, ওয়ার্ক এডুকেশন-এ বেশী নম্বর পেয়েছিলাম।

প্রশ্ন : অন্যান্য বিষয়গুলো তোমার ভালো লাগে না?

উত্তর : লিটারেচার তেমন ভালো লাগে না। হাজার পড়েও নম্বর তোলা যায় না। এমনি পড়তে ভালো লাগে, পরীক্ষার জন্যে ভালো লাগে না।

প্রশ্ন : ইংরেজীতে বেশী নম্বর পাবার জন্যে কী করছ?

উত্তর : ইংরেজী ট্রানস্লেশন খুব বেশী করি। গ্রামার, প্যারাগ্রাফ, লেটার রাইটিং—এই সব টেস্‌ট পেপার থেকে করছি। আর টেক্‌সট্-এর ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তর বাড়িতে লিখে স্কুলে দিদিদের কাছ থেকে কারেকশন করিয়ে রাখছি।

প্রশ্ন : লাইব্রেরি থেকে কোন্ ধরনের বই পড়ো?

উত্তর : স্কুলের সায়েন্‌স লাইব্রেরি থেকে রেফারেন্‌স বই নিয়ে পড়ি। এমনি লাইব্রেরি থেকে গল্পের বই পড়ি। বাবা অফিস লাইব্রেরি থেকে বই আনেন, তারও কিছু কিছু পড়ি।

প্রশ্ন : তুমি মাসিক আনন্দমেলা পড়ো?

উত্তর : স্কুলের লাইব্রেরিতে নিয়মিত পড়ি।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

আগামী সংখ্যায় / নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়

উপন্যাস

মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে

মনোজদের বাড়িতে একটি অচেনা ছেলের ছবি আছে। ছবির ছেলেটাকে মনোজের খুব ভাল লাগে। ওদের বাড়িটা সত্যিই অদ্ভুত। মাস্টারমশাই দুঃখহরণবাবু, উবু না হয়ে বসলে পড়াতেই পারেন না। একদিন একটা কাক ঠাকুমাকে ভীষণ জ্বালাতন করছিল। দেখে শুনে পুরুতমশাই বললেন, এ তো কাক নয়, নিশ্চয়ই আত্মা-টাত্মা। ওদিকে ঠিক তখনই গানের মাস্টারমশাই গণেশবাবু গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দুঃখহরণবাবু হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ায় আর পারলেন না। গণেশ-বাবু দড়িটা এনেছিলেন গরুর গলা থেকে খুলে। সেই ছাড়া-গরুটা আদ্যাশক্তি দেবীকে ঢুঁসিয়ে ফেলে দিল গোবরের গর্তে। তাই নিয়ে প্রচণ্ড হৈ-চৈ। এদিকে ওই কাকের মুখে সংস্কৃত শুনে পুরুতমশাই হঠাৎ ভয় পেয়ে দৌড়ে ঢুকলেন হারাধনের ল্যাবরেটরিতে। সেখানে একটা জিনিস ছুঁতেই তাঁর টিকি পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল। মনোজের মেজোকাকা ভজহরিবাবু বাজার করতে ওস্তাদ। বাজারে গিয়ে তিনি মাছ কিনছেন, এমন সময় গোয়েন্দা বরদাচরণ তাঁকে বলেন, বাড়িতে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। তিনি এসে দেখেন, একটা কাক তাঁর দাদার পৈতে চুরি করে পেঁপেগাছে বসে আছে। বাড়ির চাকর রাম ইতিমধ্যে একটা মোষ ধরে এনে গোয়ালে বেঁধে রেখেছিল। তারপর—

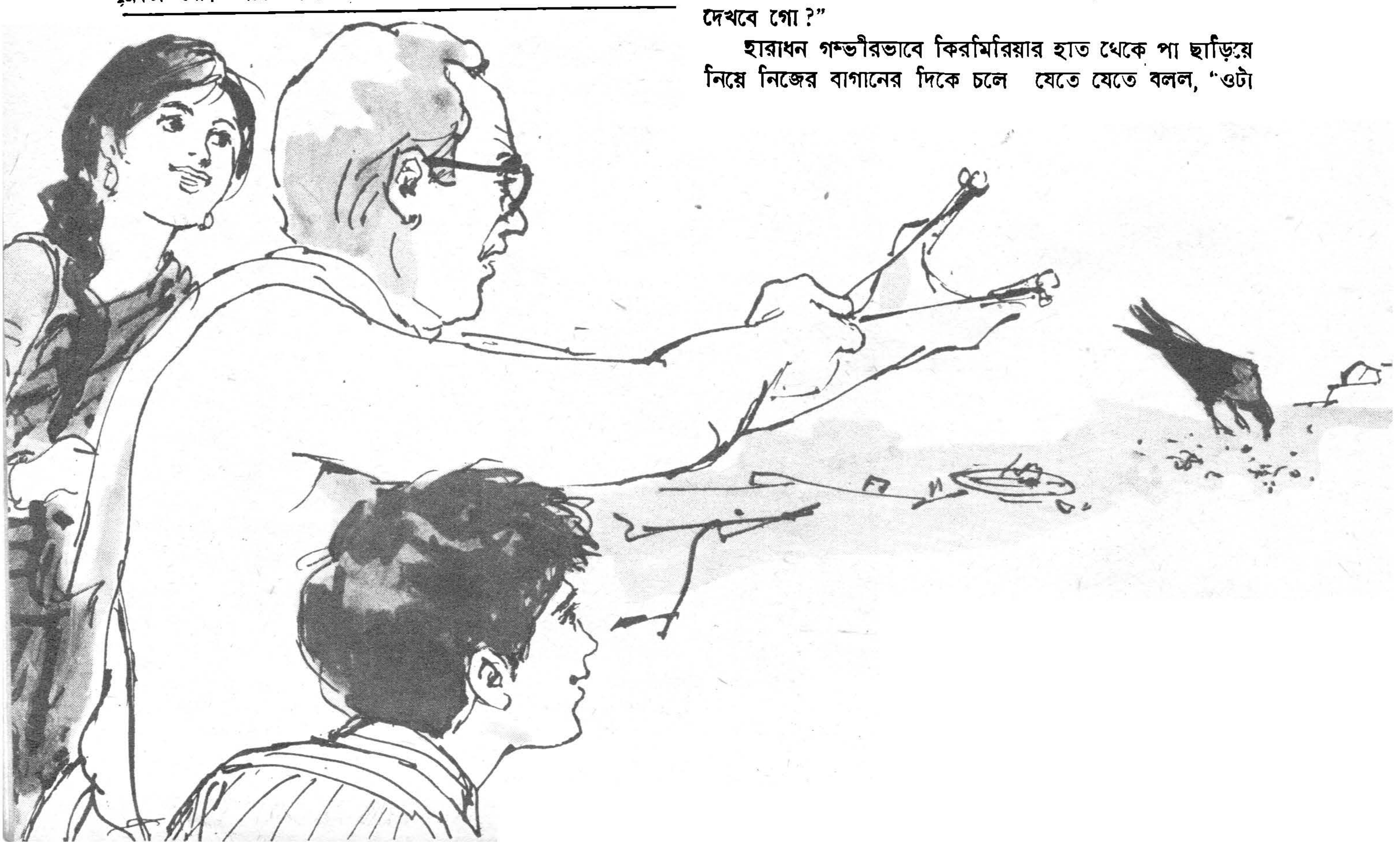

4

ব্যায়ামবীর এবং বৈজ্ঞানিক হারাধন ভূতে বিশ্বাস করে না। বাড়িতে নানারকম চেঁচামেচি শুনে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এসে সব ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করছিল। কিরমিরিয়া গিয়ে তার পা ধরে কাঁদতে বসল, "ও হারাদাদাবাবু গো, বাড়িতে এসব কী হল গো? একটা কাকভূত এসে বড়-দাদাবাবুর পৈতে নিয়ে গেল গো। বড়দাদাবাবু কথা বলতে পারবে গো?"

হারাধন কাকটার দিকে চেয়ে বলল, "কাকভূত! কাকভূত! কথাটা কেমন চেনা-চেনা ঠেকছে! অনেকটা চাগম কিংবা লামড়োর মতো!"

এখন হয়েছে কী, হারাধন শুধু ব্যায়ামবীর নয়। সে ব্যায়াম জানে, কুস্তি, বকসিং, জুডো, কারাটে জানে। আবার বৈজ্ঞানিক হিসাবেও রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, বলবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি সব কাজের কাজী। তার গবেষণা-গারের পিছনে উদ্ভিদবিদ্যার নানারকম পরীক্ষা চালানোর একটা আলাদা বাগান আছে। সেখানে অনেকগুলো কিম্ভূত গাছ রয়েছে। তার মধ্যে একটা আছে চাগম গাছ, আর একটা লামড়ো। অর্ধেক ধান আর অর্ধেক গমের বীজকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জুড়ে দিয়ে একটা সংকর বীজ তৈরী করে সে তার নাম দিয়েছে চাগম। অর্ধেক লাউবিচির সঙ্গে অর্ধেক কুমড়ো-বিচি জুড়ে হয়েছে লামড়ো গাছের বীজ। চাগম আর লামড়ো দুটো বীজ থেকেই গাছ বেরিয়েছে বটে, তবে তাতে এখনো কোনো ফসল ধরেনি। চাগম বা লামড়ো কেমন হয় তা জানবার জন্য শহরশুদ্ধ লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

হারাধনের পা ধরে কিরমিরিয়া বিলাপ করছে, "বাড়িতে কাকভূত থাকলে আমি মরে যাবো গো। ও হারাদাদাবাবু, আমি মরে গেলে তোমার চাগম দিয়ে লামড়োর ঘণ্ট কে চেখে দেখবে গো?"

হারাধন গম্ভীরভাবে কিরমিরিয়ার হাত থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের বাগানের দিকে চলে যেতে যেতে বলল, "ওটা

কাকভূত নয় রে কিরমিরিয়া। ওটা হয় কাক, না হয় তো ভূত।"

সতীশ ভরদ্বাজ একটু সুস্থ হয়ে বসে রাখোবাবুর জন্য নতুন পৈতে গ্রন্থি দিচ্ছিলেন। শেষ গ্রন্থিটা দিতে দিতে গম্ভীর গলায় বললেন, "ভূত।"

রাখোবাবু সতীশ ভরদ্বাজের হাত থেকে পৈতেটা কেড়ে নিয়ে গলায় পরেই বললেন, "কাক।"

সতীশ ভরদ্বাজ মাথা নেড়ে বললেন, "ভূত। ওকে আমি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বলতে শুনেছি নিজের কানে।"

রাখোবাবু বললেন, "কাক। নোংরা, বজ্জাত, পাজি, ছুঁচো একটা কাক। নিজের চোখে দেখেছি।"

সতীশ ভরদ্বাজ বললেন, "ভুল দেখেছেন।"

রাখোবাবু বললেন, "ভুল শুনেছেন।"

সতীশ ভরদ্বাজ বললেন, "না।"

রাখোবাবু বললেন, "আমারও ঐ এক কথা। না।"

সতীশ ভরদ্বাজ বললেন, "ওটা যে ভূত নয় তা প্রমাণ করতে পারেন?"

"করছি।" বলে রাখোবাবু পেল্লায় চেঁচিয়ে ডাকলেন, "মনোজ।"

মনোজ গুটিগুটি এগিয়ে বলল, "কী?"

"তোর গুলতিটা নিয়ে আয় তো। কয়েকটা বেশ ভারী দেখে পাথরও আনিস। কাকটার উচিত-শিক্ষা হওয়া উচিত।"

মনোজ দৌড়ে তার গুলতি আর কয়েকটা পাথর নিয়ে এল। রাখোবাবু বড়সড় একটা পাথর গুলতিতে ভরে টিপ করতে লাগলেন। মনোজের ঠাকুমা যে নৈবেদ্য রেখে গেছেন কাকটা উঠোনে নেমে এসে তা খাচ্ছিল। মনোজ, সরোজ আর পুতুল বাবার হাতের টিপ দেখবে বলে দম বন্ধ করে আছে।

সরোজ বলল, "বাবা ঠিক লাগাবে।"

মনোজ বলল, "পারবে না।"

পুতুল বলল, "তিন বারে পারবে।"

ঠিক এই সময়ে পেঁপে গাছের পিছনের দেয়াল টপকে একটা টুপিওলা মুখ উঁকি মারল।

সরোজ মনোজ একসংগে চেঁচিয়ে বলল, "চাক্কুদা!"

রাখোবাবু কাকটাকে টিপ করতে করতে বিরক্ত হয়ে বললেন, "কাজের সময়ে বড় বিরক্ত করিস তোরা। আর এ কাকটাও অসম্ভব বজ্জাত। কিছুতেই এক জায়গায় স্থির হয়ে বসছে না।"

চাক্কু খুব ভাল ফুটবল, ক্রিকেট খেলে, জুড়ো জানে, বকসিং করে। ব্যায়াম আর প্যাঁচ শিখতে সে রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যায়ামবীর হারাধনের কাছে আসে। তাকে যে লুকিয়ে আসতে হয় তার কারণ চাক্কুর মামা গোয়েন্দা বরদাচরণের সঙ্গে মনোজের কাকা হারাধনের একেবারেই সদ্ভাব নেই। হারাধন আর বরদাচরণ কেউ কাউকে দেখতে পারেন না।

হারাধনের নাম শুনলে বরদাচরণ বলেন, "বৈজ্ঞানিক? হুঁ!"

আশ্চর্য এই, বরদাচরণের নাম শুনলে হারাধনও অবিকল একই সুরে বলেন, "গোয়েন্দা! হুঃ!"

বরদাচরণও কুস্তি, বকসিং, জুডো ইত্যাদি নাকি ভালই জানেন। তবে এসব ব্যাপারে বরদা আর হারার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তার কোন মীমাংসা হয়নি।

চাক্কু দেয়ালের ওপর মুখ তুলে বাড়ির ভিতরটা ভাল করে দেখে নিয়ে মুখে আঙুল পুরে দুটো অদ্ভুত শিস দিল। শিসের শব্দ হতে-না-হতেই দেয়ালের ওপর বরদাচরণের মুখখানা ভেসে উঠল এবার। তিনিও বাড়ির ভিতরটা দেখতে লাগলেন।

সরোজ মনোজ ফের চেঁচাল, "গোয়েন্দাকাকু!"

রাখোবাবু চাক্কু বা বরদাচরণকে লক্ষই করেননি। তিনি অতি নিবিষ্ট মনে গুলতির তাকের মধ্যে কাকটাকে আনবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু নচ্ছার কাকটা কিছুতেই স্থির থাকছে না, কেবল লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। সরোজ-মনোজের চেঁচামেচি শুনে বিরক্ত রাখোবাবু বললেন, "আঃ, একটু চুপ করবি তোরা? কনসেনট্রেশন নষ্ট করে দিলে লোকে কী করে জরুরী কাজ করবে? যতক্ষণ কাকটার গায়ে না লাগছে ততক্ষণ

আমি অফিস যাব না বলে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছি।"

কাকমারা ভুলে গিয়ে সরোজ মনোজ পুতুল তখন হাঁ করে দেখছে, গোয়েন্দা বরদাচরণ আর চাকু দেয়ালের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে।

দুজনের দেয়াল টপকানো দেখে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। সাধারণত গোয়েন্দা বরদাচরণ কখনো সদরদরজা দিয়ে ঢোকেন না। তাতে নাকি গোয়েন্দার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়, লোকে গোয়েন্দা বলে খাতির করে না। গোয়েন্দাদের আচার-আচরণে একটা রহস্যময়তা না থাকলে লোকে সেই গোয়েন্দাকে মানবেই বা কেন? গোয়েন্দারা কখনো সহজ পথে চলবেন না, সহজ পথে ভাববেন না, সহজ চোখে চাইবেন না। সব সময়ে এমন আচরণ করবেন যাতে লোকে চমকে, আঁতকে, ভয় খেয়ে বা ভিরমি লেগে যায়। তাই গোয়েন্দা বরদাচরণ বেশির ভাগ বাড়িতেই দেয়াল টপকে, জানালার শিক বেঁকিয়ে ঢোকেন। শোনা যায়, এক বাড়িতে নাকি সিঁধ কেটেও ঢুকেছিলেন।

তবে চেনাজানা লোকের বাড়ি না-হলে তিনি এতটা করেন না।

যাই হোক, বরদাচরণ দেয়ালের ওপর উঠে গলা থেকে ঝোলানো একটা বাইনোকুলার তুলে চোখে লাগিয়ে চারদিক দেখছিলেন। তাঁর সেই দেখা আবার দেখছিল সরোজ, মনোজ পুতুল, সতীশ ভরদ্বাজ। আর ঠিক সেই সময়ে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে ঠাকুরঝি ভেজা পায়ে আর একবার পড়ি-পড়ি করেও সামলে গিয়ে দাঁড়িয়ে চাকু আর বরদাচরণকে দেখতে পেলেন।

রাখোবাবু কাকটার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "কেউ কি নেই যে কাকটাকে এক জায়গায় একটু ধরে রাখবে স্থির করে?"

কাকটার খাওয়া হয়ে গেছে। এবার সে একটা উড়াল দিয়ে ফের পেঁপে গাছটায় বসল। রাখোবাবু বললেন, "এই বার! এইবার!"

বলতে বলতে পেপে গাছের দিকে কাকটাকে টিপ করতে গিয়ে তিনি দেয়ালের ওপর মামা-ভাগ্নের মূর্তি দেখে চমকে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বললেন, "কে রে? অ্যাঁ? কার এই সাহস যে দেয়ালে উঠেছিস?"

তাক করা গুলতি দেখে, আর সেই গর্জন শুনে তৎক্ষণাৎ চাকু পচাং করে দেয়ালের ওপিঠে লাফিয়ে পড়ল। বরদাচরণ তা পারলেন না। চাকু ছেলেমানুষ, সে হালকা শরীরে যত লাফ-ঝাঁপ করতে পারে, বরদাচরণ তা পারেন না। এ বয়সে লাফ-টাফ দিলে হাত-পা ভাঙতে পারে। তবে তিনি বাইনোকুলারটা ফেলে দুটো হাত ওপর দিকে তুলে বলে উঠলেন, "সারেন্ডার! গুলতি ছুঁড়বেন না। আমি বরদাচরণ।"

"ও, বরদাবাবু।" বলে রাখোবাবু গুলতি নামিয়ে নিলেন। বললেন, "কী খবর?"

"খবর খুব সাংঘাতিক, আমি একটা তদন্তে এসেছি।"

"তদন্ত! কিসের তদন্ত মশাই?"

"বলছি।" বলে বরদাচরণ দেয়াল থেকে নামবার উপায় খুঁজতে থাকেন। দেয়ালটা মস্ত উঁচু, চাকু লাফ দিলেও বরদাচরণ তা করতে ভরসা পান না। তাই খুব সাবধানে দেয়ালের ওপর দিয়ে হেঁটে পেপে গাছটার কাছ-বরাবর যেতে থাকেন। ইচ্ছে, পেঁপে গাছ বেয়ে নেমে আসবেন।

সতীশ ভরদ্বাজ বলে ওঠেন, "উঁহু, উঁহু, বড় নরম গাছ,

ভেঙে যাবে। গাছে আবার কাকভূতও বসে আছে।"

রাখোবাবু বললেন, "ভূত নয়। কাক।"

সতীশ ভরদ্বাজ বললেন, "ভূত।"

"কাক।"

"ভূত।"

"কাক।"

"ভূত।"

কিন্তু মীমাংসা হল না বলে দুজনেই দুজনের দিকে খানিক কটমট করে চেয়ে রইলেন।

ওদিকে, বরদাচরণ কাকটার কথা জানতেন না, পেঁপে গাছের সহনশীলতা সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান নেই। যেই পেঁপে গাছের ডগাটা ধরতে গেছেন অমনি ভূতুরে কাকটা বলে উঠল, "খাওরুখার!"

"উঁ।" সতীশ ভরদ্বাজ বলেন, "শুনলেন তো! পরিষ্কার বলল—খবরদার।"

রাখোবাবু বলেন, "ওটা কাকের ডাক।"

বরদাচরণ কাকটাকে বললেন, "হুশ! হুশ?"

কাক বলল, "ক্যা?"

বরদা বললেন "চোপরাও কেলেভূত। পালা! যাঃ, যাঃ!"

কাক বলল, "কটর, কটর।"

সতীশ ভরদ্বাজ বললেন, "শুনুন। বলছে, কেটে পড়, কেটে পড়।"

বরদাচরণ তখন ট্যাক থেকে রিভলবার বার করে ফেলেছেন। কাকটাকে শাসিয়ে বললেন, "দেব খুলি উড়িয়ে? যাঃ বলছি!"

কাকটা হুড়ুশ করে উঠে বরদাচরণের মাথায় একটা রাম-ঠোক্কর মারল। বরদাচরণ পেঁপে গাছের ডগা শুদ্ধু ভেঙে নিয়ে হড়াস করে উঠোনে পড়লেন। সেই শব্দে বাড়িময় দৌড়োদৌড়ি চেঁচামেচি পড়ে গেল।

বামাসুন্দরী এসে বরদাচরণকে হাত ধরে তুলে বললেন, "কেন বাবা বরদা, সামনে সদর-দরজা থাকতেও দেয়াল টপকাতে গেলে?"

বরদাচরণ নিজের কোমর-হাত দিয়ে মালিশ করতে-করতে ব্যথার মধ্যেও বললেন, "তাতে কী মাসিমা, গোয়েন্দাদের কত রিস্ক নিতে হয়! এ তো দেয়াল থেকে পড়া দেখলেন, সিমলায় একবার পাহাড় থেকে পড়তে হয়েছিল। চলন্ত ট্রেন বা মোটর থেকেও কতবার লাফ দিয়েছি। গোয়েন্দাদের ব্যথা লাগে না।"

কাকটা আবার দেয়ালে বসেছে, গলায় পৈতে। বামাসুন্দরী তাকে আর-একবার নমস্কার করে ঘরে চলে গেলেন। রাখোবাবুও গুলতিটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, "না, এ কাকটা খুবই ডেঞ্জারাস দেখছি! গুলতি মারলে হয়তো আবার রিভেঞ্জ নিতে তেড়ে আসবে।"

"তবে?" বলে সতীশ ভরদ্বাজ খুব সবজান্তা হাসি হাসলেন। বললেন, "সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণভূত।"

বরদাচরণের পিস্তলটা ছিটকে পড়েছিল জবা গাছের গোড়ায়। সরোজ সেটাকে কুড়িয়ে সুট করে মনোজের হাতে চালান দিল। মনোজ জামার তলায় লুকিয়ে নিয়ে পুতুলের হাতে পাচার করল। পুতুল সেটা নিয়ে নিজের পুতুলের বাক্সে ন্যাকড়া চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখে ভালমানুষের মতো মুখ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বরদাচরণের অবশ্য পিস্তলটার কথা খেয়াল হল না। পড়ে গিয়ে তাঁর ঘিলু নড়ে গেছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। নিতান্ত গোয়েন্দাদের অজ্ঞান হতে নেই বলে তিনি অজ্ঞান হননি। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে তিনি বারান্দায় রাখোবাবুর মুখোমুখি বসে বললেন, "ব্যাপারটা খুবই জরুরী এবং গোপনীয়। আমি একটা পুরনো ফোটোগ্রাফের সন্ধানে আপনার বাসায় এসেছি। একটা ছোটো ছেলের ফোটোগ্রাফ।"

*

বরদাচরণের পড়ে যাওয়ার শব্দে দুঃখবাবু আর গণেশ ঘোষালও ছুটে এসেছিলেন। তেমন কিছু হয়নি দেখে তাঁরা হতাশ হলেন।

নিজেদের ঘরের দিকে যেতে যেতে গণেশবাবু বললেন, "আচ্ছা দুঃখবাবু, মোষের কি গোবর হয়?"

দুঃখহরণবাবু চিন্তিত হয়ে বললেন, "মোষের গোবর? কী জানি, ঠিক বলতে পারছি না। ষাঁড়ের গোবর বলে একটা কথা আছে বটে, কিন্তু মোষের গোবর কখনো শুনিনি। তবু চলুন, ডিকশনারিটা একবার ঘেঁটে দেখি।"

গণেশবাবু বললেন, "ডিকশনারি দেখতে হবে না। আমি আজ জানতে পেরেছি, মোষেরও গোবর হয়।"

"কী করে জানলেন?"

গণেশবাবু বললেন, "আমার বাক্সের চাবি পৈতের বাঁধা থাকে। সকাল থেকে সেটা খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় হারাল তা খুঁজতে খুঁজতে শেষে গোয়ালে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। কী দেখলাম জানেন?"

"কী"

"দেখি কি, গোয়ালঘরে একটা বিশাল চেহারার মোষ বাঁধা। মোষটা এক কাঁড়ি নেদে রেখেছে। আদ্যাশক্তি দেবী তো খুব গোবর ভালবাসেন, দেখলাম তিনি একটা পেতলের গামলায় সেই নাদি দুহাত ভরে ভরে তুলছেন আর আপনমনে এক গাল হেসে-হেসে খুব আহ্লাদের সঙ্গে বলছেন—আহা, আজ একেবারে গোবরে-গোবরে ভাসাভাসি কাণ্ড। কত গোবর! জন্মে এত গোবর দেখিনি বাবা! গোবর দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, বুকটা ঠাণ্ডা হয়।"

"বটে?"

"তবে আর বলছি কী! পরিষ্কার দেখলাম মোষ। চোখ কচলে, নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখেছি, আমার দেখার ভুল নয়। হাতির মত বিশাল, বিটকেল মোষ। আদ্যাশক্তি দেবী তার নাদি তুলতে তুলতে পরিষ্কার বললেন, "গোবর। তাই ভাবছি মোষের গোবর হয় কি না! এখন মনে হচ্ছে, হয়।"

দুঃখহরণবাবু বললেন, "কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি। গোয়ালঘরে মোষটা এল কী ভাবে?"

গণেশবাবু বললেন, "আমি কিন্তু তা ভাবছি না। আজ এক আশ্চর্য জ্ঞান লাভ করে আমার মাথাটা ভরে গেছে। মোষেরও যে গোবর হয়, এ একটা নতুন আবিষ্কার। সেই গোবরের চিন্তায় আমার মাথা ভর্তি।"

দুঃখবাবু মাথা নেড়ে বলেন, "তা জানি। কিন্তু অন্য দিকটাও একটু খেয়াল করবেন। মোষটা হঠাৎ এল কোত্থেকে? আর মোষটা গোয়ালে আসার পরেই হঠাৎ গোয়েন্দা বরদাচরণ এসে হাজির হল কেন? বিশেষত, গরু চুরির মামলার তদন্তে বরদাচরণের খুব নামডাক। এখানে যতগুলো গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে, তার সব কটাই বরদাচরণ নিষ্পত্তি করেছে। তাহলে—"

"তাহলে কি আপনি বলতে চান, মোষটা চুরি করে আনা হয়েছে?"

দুঃখহরণবাবু বললেন, "তাই তো মনে হচ্ছে। তবে ওর ভিতর আরো কোনো রহস্য থাকাও অসম্ভব নয়।"

(ক্রমশ)

ধাঁধা আর ধাঁধা

সন্ধে পার করে বেড়িয়ে ফিরল ছোটকা।

"যে-বাড়িতে গিয়েছিলাম আজ, সে-বাড়ি নিয়েই চমৎকার একটি ধাঁধা হয়।" জামা খুলতে-খুলতে ছোট্‌কা বলে, "বাড়ি বটে একখানা। বুড়ো এক দাদুর সঙ্গে আলাপ হল। যা হেঁয়ালি করে কথা বলেন না ভদ্রলোক!" ছোট্‌কার অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে থাকি।

"চার নাতনী ভদ্রলোকের। মীরা, লীলা, অনীতা এবং বীণা। প্রত্যেকেই দারুণ শিক্ষিতা। একটি করে বিদেশী ভাষা জানে প্রত্যেকে। প্রত্যেকে আবার আলাদা একটি করে বাজনাও শেখে। আমি ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম, 'মীরা কী বাজায়?'

'গীটার।' জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

'আর বেহালা?' পরের প্রশ্ন করতেই হেঁয়ালি-মেশানো গলায় উত্তর দিলেন ভদ্রলোক, 'নাম তো বলতে পারব না ভাই। এটুকু শুধু বলতে পারি, যে ফরাসী জানে, সে-ই বাজায় বেহালা।'

এরপর ভদ্রলোক গড়গড় করে যা-যা বলে গেলেন তা সবই নেতিবাচক। বীণা এস্রাজ বাজায় না। যে জার্মান ভাষা বলে সে লীলা নয়। ইটালীয়ান জানে না মীরা। অনীতা বেহালা শেখেনি, শেখেনি স্প্যানিশ ভাষাও। বীণা ফরাসী ভাষা জানে না। লীলার সেতারে উৎসাহ নেই। যে এস্রাজ বাজায়, তার ইটালীয়ান ভাষায় দখল নেই।

এটাই হোক এবারের **প্রথম ধাঁধা**। কে কোন্ ভাষা জানে আর কোন্ বাজনা বাজায়, কী বলো সতুবাবু?"

ছোট্‌কার কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিই আমি।

দ্বিতীয় ধাঁধা: একটি বইয়ের দুটি পৃষ্ঠা খোলা। পৃষ্ঠার সংখ্যা দুটির যোগফল ৭৭। কোন্ কোন পৃষ্ঠা খোলা?

তৃতীয় ধাঁধা: শ্যামের টাকার অর্ধেক যদি আমি পাই আমার ১০০ টাকা হয়। আমার টাকার এক-তৃতীয়াংশ শ্যাম নিলে তারও ১০০ টাকা হবে। কার কত টাকা?

চতুর্থ ধাঁধা: নীচের লেখাটি পড়তে পারছ? হিজিবিজি নয়। মানে আছে। সংকেতের গূঢ় রহস্য ভেদ করে, পরের তিনটি অক্ষর কী হতে পারে তা বার করতে হবে।

OTTFFSS □ □ □

গতবারের ধাঁধার উত্তর: (১) তিনজনই বৃক্ষবাসী নয়, প্রথমেই বোঝা যাবে। কেননা. দু-রকম জবাব এসেছে। যদি দু-জন বৃক্ষবাসী থাকত—তাহলে, ধরে নিতে হবে, প্রথম জন সত্যি কথা বলেছে, অন্য দু-জন মিথ্যে কথা—কিন্তু সেক্ষেত্রে বৃক্ষবাসীর শর্ত মিলছে না, কেননা. বৃক্ষবাসীরা সত্যি কথা বলে। যদি এই দলে. ধরে নেওয়া হয়, একজন মাত্র বৃক্ষবাসী, সেক্ষেত্রে শেষ দু-জন সত্যবাদী হয়ে পড়ে। তাও অসম্ভব। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, তিনজন দ্বীপ-বাসীই ছিল গুহাবাসী। (২) ২৫০ পাখি ও ১২৫ পশু। (৩) ৯ দিনে। (৪) প্রথমে বাঘ আর পান এপারে রেখে শুধু ছাগল নিয়ে ওপারে যাবে। পরে এপারে এসে বাঘ নিয়ে ওপারে রেখে আসার সময় ছাগলটিকে আবার নিয়ে আসবে এপারে। ছাগলটিকে এ-পারে রেখে পান নিয়ে যাবে ওপারে। আবার একা ফিরে এসে ছাগল নিয়ে শেষ বারের মতো পার হবে। এ না হলে বাঘ ছাগল খেয়ে ফেলবে, কিংবা ছাগল খেয়ে ফেলবে পান।

সত্যসন্ধ

আচ্ছা বলো তো

প্রঃ ভদ্রলোক হাওড়া স্টেশনে টিকিট কাটতে এসেছেন। কোথাকার টিকিট জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন লাট্টুর ডগা ঢাকা। তিনি কোথায় যেতে চেয়েছিলেন?
উঃ আলমোড়া।

প্রঃ জিরাফের গলা কেন এত লম্বা?
উঃ সেটা তোমার চোখে। জিরাফ ভাবে মানুষের গলা কেন এত বেঁটে।

প্রঃ কোন্ প্রদেশের তলার দিকটা উড়িয়ে দিলে সে চোখে দেখতে পায় না?
উঃ অন্ধ্র প্রদেশ।

প্রঃ এখন মাঝরাত। তুমুল বৃষ্টি পড়ছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে কি খটখটে রোদ হবে?
উঃ না, কারণ তখনও মাঝরাত।

প্রঃ সীতার নাম জান কি?
উঃ হ্যাঁ, জানকী।

প্রঃ কোন্ মেয়েটার খালি খালি ঘুম পায়?
উঃ যার নাম তন্দ্রা।

প্রঃ কোন্‌খানে নদী নেই তবু দুটো সেতু আছে?
উঃ জোড়াসাঁকো।

প্রঃ কোন্ পাড়ার লোকেরা জামা সেলাই করে?
উঃ দর্জিপাড়া।

প্রঃ কোন্ ফুল আর পাখির নাম এক?
উঃ বক।

প্রঃ সমুদ্রে জল নেই, শহরে বাড়ি নেই, পৃথিবীতে মানুষ নেই এমন জায়গা কোথায়?
উঃ ম্যাপে।

প্রঃ কোন্ পাখিকে বলা হচ্ছে পাক দিতে?
উঃ পেঁচা।

প্রঃ এমন কোন জায়গা আছে যা কখনো সোজা হয় না?
উঃ উল্টোডাঙা।

প্রঃ কুকুরটা ঘেউঘেউ করছে কেন?
উঃ মিউমিউ করতে পারে না বলে।

প্রঃ দাঁত আছে তবু চিবোয় না কে?
উঃ চিরুনি।

প্রঃ কোন নদী সমুদ্র?
উঃ সিন্ধু।

প্রঃ কোন নদী ঈশ্বরের সন্তান?
উঃ ব্রহ্মপুত্র।

প্রঃ কোন্ পাখি ওলটালে মাছ হয়?
উঃ শালিখ।

ভানুমতী

ভাবতে পারো?

রিপলি

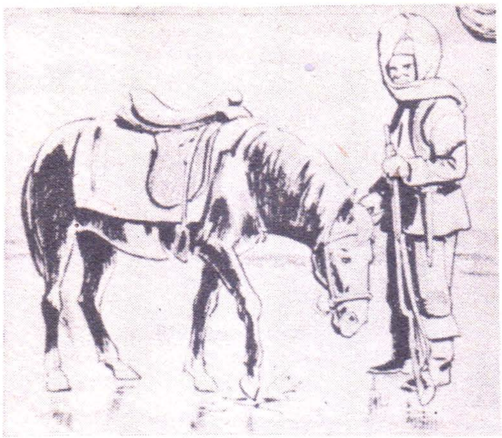

তুষারে জমে-যাওয়া হ্রদ ফারিয়ার উপরে তিব্বতী টাট্টু-ঘোড়াগুলো পায়ের খুরে দিয়ে বরফ খুঁড়ে জল খায়।

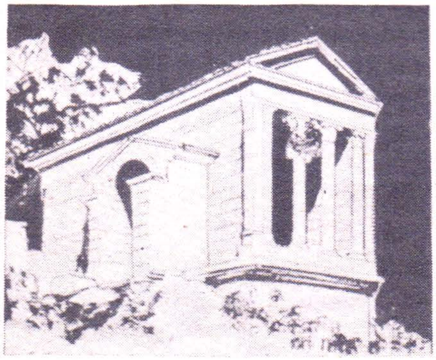

চোদ্দ শ' বছর আগে ইতালির ট্রেভিতে সান্ সালভাতোর গির্জা গড়ে তোলা হয়েছিল এক রোমান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মালমশলা দিয়ে।

সুন্দরী ক্রীতদাসীর মুখের মধ্যে যে কিস্‌মিস্ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন দামাস্কাসের খলিফা দ্বিতীয় এজিদ (৬৮৩-৭২৪ খৃঃ), তাতেই দম আটকে সে মারা যায়। খলিফা তাতে এতই দুঃখ পান যে, বলতে গেলে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই, তিনি ভগ্নহৃদয়ে মারা গিয়েছিলেন। চিকিৎসকেরা রায় দিয়েছিলেন, খলিফার মৃত্যুর কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর হৃৎপিণ্ডে চিড় ধরেছিল।

শব্দ-সন্ধান

তোমরা অনেকেই চিঠি লিখে দাবি জানিয়েছিলে যে, মাসিক আনন্দমেলার প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল বা শব্দছকের ধাঁধা দেওয়া হোক। আমরা সেই দাবি মেনে নিলাম। এখন থেকে প্রত্যেক সংখ্যায় এই ধাঁধা থাকবে। এবারকার ছকটির বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও স্থানের নাম দিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে। সূত্র দেখে উত্তর খুঁজে নাও।

সূত্র, পাশাপাশি ॥ (২) যেখানকার অধিপতি মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেননি। (৫) প্রাচীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ রাজা। (৬) মোগল সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র। (৮) একাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরী কবি।

সূত্র, উপর থেকে নীচে ॥ (১) মারাঠী বীর। (৩) বারো ভুঁইয়ার একজন। (৪) বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। (৭) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিখ্যাত সেনাপতি।

(সমাধান আগামী সংখ্যায়)

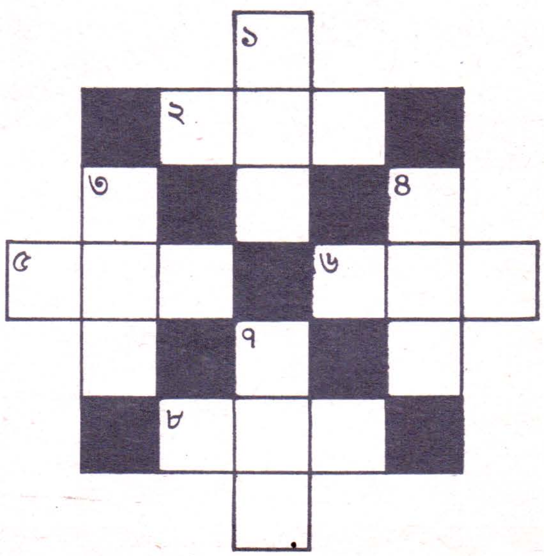

টিনটিন বোম্বেটে জাহাজ

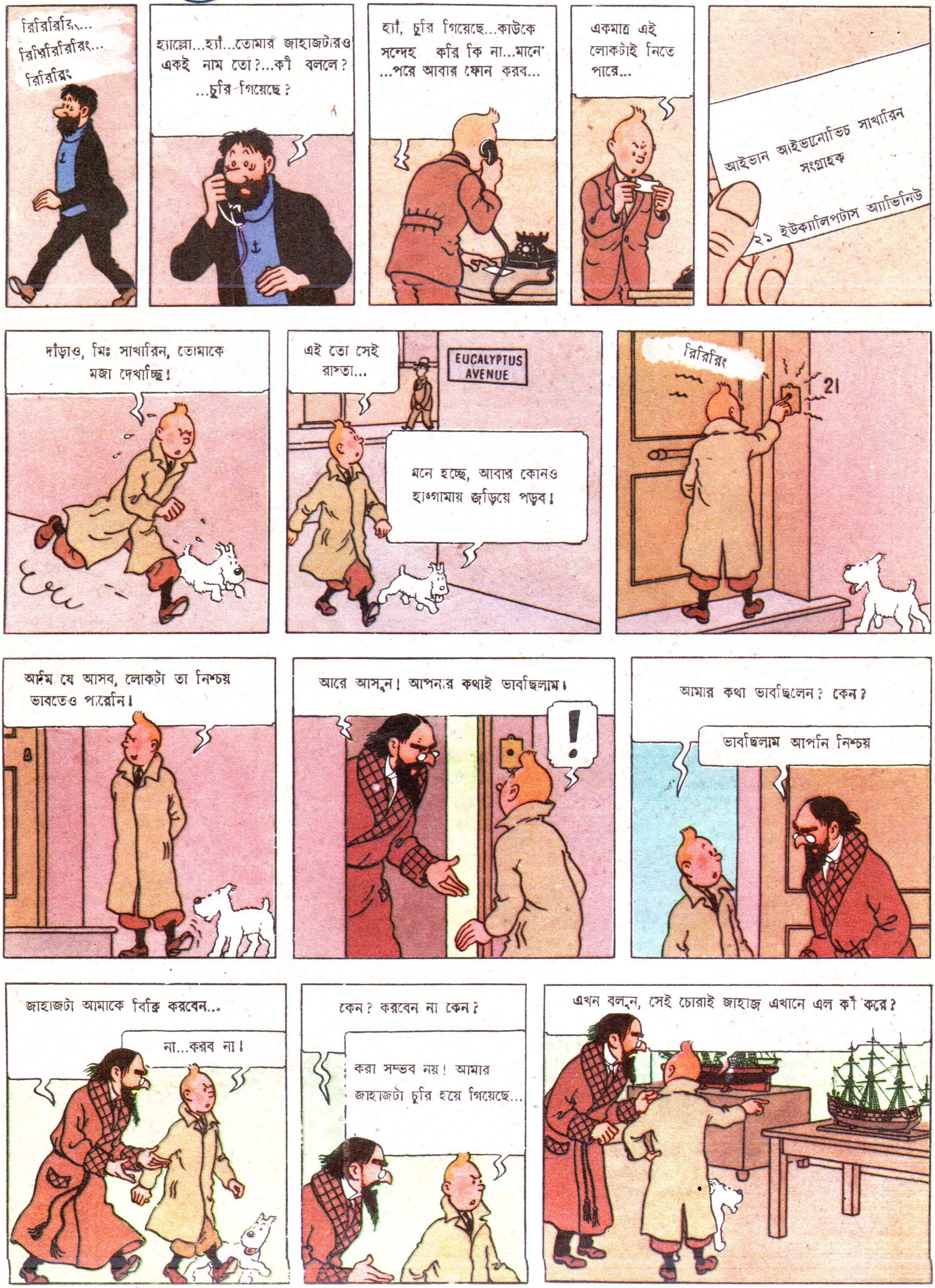

(এর পর বিয়াল্লিশের পাতায়)

আমাদের কলকাতা

রত্নাকর

প্রিয় মেজদি,

কাল তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি কলকাতার আরও নতুন-নতুন জায়গার কথা লিখতে বলেছ, কিন্তু কী করে লিখি বলো তো! কলকাতায় এখন অবশ্য অনেক দেখার জিনিস হয়েছে, তবে ছোটমামাটা কিছুতেই নিয়ে যেতে চায় না। ছুটির দিনে শুধু বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারবে। গত রোববার মীনু এমন বায়না ধরেছিল যে, ছোটমামা বাধ্য হয়ে আমাদের বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস বায়না ধরেছিল! আসলে কী হয়েছিল জানো? মীনুকে বাবা একটা খেলনা-জাহাজ কিনে দিয়েছে। জাহাজটা নিয়ে ও দিনরাত্তির খেলে। ওর কাছে বিছানাটা হচ্ছে সমুদ্দুর। যখন-তখন বিছানায় উঠে জাহাজ চালায়। মা ওকে কত বারণ করেছে, কিন্তু কী-রকম জেদী মেয়ে জানো তো. মায়ের কথা শুনতেই চায় না। মা তখন বলল, "যদি আর বিছানা নোংরা না করো, তাহলে ছোটমামা তোমাকে সত্যি-সত্যি জাহাজ দেখাতে নিয়ে যাবে।" শুনেই মীনু রাজী, আর তারপরেই বায়না।

আমরা বাসে চড়ে সোজা আউটরাম ঘাটে এসে নামলাম। অনেকদিন আগে একবার মায়ের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, তখন চারদিকে কী নোংরা ছিল। কিন্তু এবার গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে চমকে উঠলাম। কী সুন্দর হয়ে গেছে গঙ্গার ধারটা। মধ্যিখানে পরিষ্কার রাস্তা, দুদিকে গাছপালা আর বসার বেঞ্চি। বসে-বসে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখতে কী ভাল লাগে। এখন বর্ষাকাল তো, গঙ্গাটা খুব চওড়া হয়ে গেছে, কত নৌকো নদীতে। তীরে দাঁড়িয়ে হাওড়া ব্রিজের পুরোটা একসঙ্গে দেখা যায়। তুমি যদি তোমার কোনো বিদেশী বন্ধুকে কলকাতায় নিয়ে আসো তাহলে আউটরাম ঘাট থেকে তাকে হাওড়া ব্রিজ দেখিও, দেখবে তার ভীষণ ভাল লাগবে। গঙ্গার ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমরা জেটির কাছে চলে গেলাম। একটু দূরে একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল, সত্যি-সত্যি জাহাজ দেখে মীনু তো অবাক। জাহাজটা কী বিরাট! অথচ ছোটমামা বলল, এটা একটা বাচ্চা জাহাজ, বড় জাহাজ এই গঙ্গায় আসতেই পারে না। মেজদি, তুমি না দেশে ফেরার সময় জাহাজে চড়ে ফিরো, তোমার কাছে আমরা জাহাজের গল্প শুনব। জেটির কাছে একটা দোতলা রেস্টুরেন্ট আছে। আমরা দোতলায় উঠে খেলাম। ওখানে আমরা অনেকক্ষণ বসেছিলাম। তারপর নেমে বড় রাস্তা পেরিয়ে মাঠে গেলাম। মাঠে অনেক লোক বসে-বসে গল্প করছিল। আমরা ওখানে বসে আইসক্রিম খেলাম। ছোটমামা মীনুকে দুটো বেলুন কিনে দিল। বাড়ি ফিরে এসে মীনুর সে কী গল্প! তবে মীনু কথা রেখেছিল, ও আর বিছানায় উঠে জাহাজ চালায়নি। তুমি আর জামাইবাবু আমার প্রণাম নিও, বুবুনকে দিও অনেক অনেক ভালবাসা।

—তোমার শমী

মহাভারতের গল্প **অমিতা চক্রবর্তী**

ভীমের অমৃতপান

ছোটবেলা থেকেই ভীমের গায়ে ছিল ভীষণ জোর, আর এই জন্যেই দুর্যোধন আর তাঁর ভাইরা তাঁকে মোটেই দেখতে পারতেন না। ভীমও সুযোগ পেলেই তাঁদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়তেন। কখনও আচ্ছাসে তাদের মাথায়-মাথায় দিতেন ঠুকে, কখনও বা সাঁতার কাটার সময় কৌরবদের জনা দশেক ভাইকে জলের মধ্যে এমনভাবে চেপে ধরতেন যে, তাদের দম ফুরিয়ে যাবার অবস্থা হত। কোনোদিন হয়ত তাঁরা গাছে উঠেছেন ফল পাড়ার জন্য, ভীম দেখতে পেয়ে নীচে থেকে এমন জোরে গাছটা নাড়াতে থাকতেন যে, পাকা ফলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও টুপটাপ খসে পড়তেন মাটিতে। ভীমের কাছে বারবার জব্দ হয়ে তাঁদের খুব রাগ হত, কিন্তু ভয়ে কেউ কিছুই বলতে পারতেন না। দুর্যোধন ছিলেন খুবই হিংসুটে প্রকৃতির। তিনি ভাবলেন, ভীমের এখনই যে-রকম শক্তি, বড় হলে তো কোনোমতেই ওর সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। পাণ্ডবদের ফাঁকি দিয়ে সিংহাসনে বসার আশাও কম। তবে ভীমকে যদি এখনই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর চারটে ভাইকে বেঁধে ফেলতে কতক্ষণ! তারপর সুখে রাজত্ব করা যাবে। দুর্যোধন একটা ফন্দিও এঁটে ফেললেন।

রাজধানী হস্তিনাপুরের কিছু দূর দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গা। তার তীরে বিরাট বাগান। সেখানে একদিন বন-ভোজনের ব্যবস্থা হল। রাজারাজড়ার ব্যাপার তো, জাঁকজমকই আলাদা! কত সুন্দর-সুন্দর তাঁবু ফেলা হল। ভেতরে কত না আরামের উপকরণ! বাগানটিও চমৎকার—ফোয়ারা, পদ্মদীঘি, রাজহাঁস, অজস্র ফুলের কেয়ারি! খাবার দাবারের ঢালাও আয়োজন। এবার দুর্যোধনের দিক থেকে নেমন্তন্ন এল যুধিষ্ঠিরের কাছে, "চলুন, সবাই মিলে একদিন গঙ্গার তীরে বেড়াতে যাওয়া যাক।" যুধিষ্ঠির রাজি হয়ে গেলেন। নির্দিষ্ট দিনে পাণ্ডব ও কৌরবদের একশ পাঁচ ভাই রওনা দিলেন সেই বাগানবাড়ির দিকে। সে কী বিরাট শোভাযাত্রা! বাগানে এসে তাঁদের চোখ জুড়িয়ে গেল। সবকিছুরই নিখুঁত আয়োজন। পৌঁছেই শুরু হল একদফা খাওয়া-দাওয়ার পালা। দুর্যোধন দেখলেন এই সুযোগ। আলাদা-করে-রাখা কিছু মিষ্টি তুলে ধরলেন ভীমের মুখে। ভীমও সরল মনে সেগুলো খেয়ে ফেললেন। খাবারে ছিল বিষ মেশানো। এবার সবাই নামলেন গঙ্গায় সাঁতার কাটতে। অনেকক্ষণ সাঁতার কাটার পরে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যাও হয়ে আসছে, এবার ফিরতে হবে। কিন্তু ভীমের মধ্যে তখন শুরু হয়ে গেছে বিষের ক্রিয়া। তীরের কাছে এসেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন তিনি। দুর্যোধন কাছেই ছিলেন সুযোগের অপেক্ষায়। লতাপাতা দিয়ে অচেতন ভীমকে শক্ত করে বেঁধে জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে পালিয়ে এলেন।

এদিকে বাড়ি ফেরার তাড়ায় অন্য ভাইরা ভীমের কথা ভুলে গেলেন। প্রাসাদে ফিরে এসেই ভীমের খোঁজ পড়ল। চার ভাইকে চারদিকে খুঁজতে পাঠিয়ে দিলেন কুন্তী। কিন্তু কোথায় ভীম? হতাশ হয়ে তাঁরা ফিরে এলেন। মুষড়ে পড়লেন মা ও ভাইরা।

এদিকে ভীম হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় ডুবতে ডুবতে সোজা চলে এসেছেন পাতালপুরী নাগরাজ্যে। তাঁর শরীরের চাপে বহু নাগশিশু মারা গেল। রেগে গিয়ে তাদের মা-বাবারা ছোবল দিতে লাগল ভীমকে। কিন্তু এতে ভীমের কোনো ক্ষতি হল না, উল্টে বিষে বিষক্ষয় হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে হাত-পায়ের বাঁধন কেটে উঠে দাঁড়ালেন ভীম। সামনেই ছিল অনেকগুলো সাপ, তাদের মেরে ফেলতে লাগলেন তিনি। ভীমের সেই মারমূর্তি দেখে সাপেরা ছুটে এল তাদের রাজা বাসুকির কাছে। বাসুকি এসে দেখেন যে-সে লোক নয়, তাঁরই নাতির নাতি। ভীমের দাদু রাজা কুন্তিভোজ বাসুকিরই মেয়ের ছেলে। ফলে, ভীমের তো কোনো শাস্তি হলই না, বরং শুরু হয়ে গেল আদর-আপ্যায়ন।

ভীম প্রায় আট কুম্ভ অমৃত খেলেন। খেয়ে তাঁর দারুণ ঘুম পেয়ে গেল। বাসুকির প্রাসাদে এক সপ্তাহ ধরে ঘুমোবার পরে জেগে উঠে দেখেন তাঁর শরীরের সব ক্লান্তি কেটে গেছে, গায়ে ফিরে এসেছে হাজার হাতির বল। এবার বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে তাঁর মন খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল। তখন বাসুকি তাঁকে খাইয়ে-দাইয়ে ভাল জামাকাপড় পরিয়ে আশীর্বাদ করে পাঠিয়ে দিলেন। নাগেরা তাঁকে পিঠে করে গঙ্গার তীরে সেই বাগানের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল। সেখান থেকে ভীম তাড়াতাড়ি চলে এলেন মা-ভাইয়ের কাছে। এতদিন পরে তাঁদের দুশ্চিন্তার শেষ হল। ভীমের তো ক্ষতি হওয়া দূরে থাক, উল্টে গায়ের জোর আরও বেড়ে গেল অমৃত পানের গুণে। বেচারী দুর্যোধনের এত সাধের পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল।

(উনচল্লিশের পাতার পর)

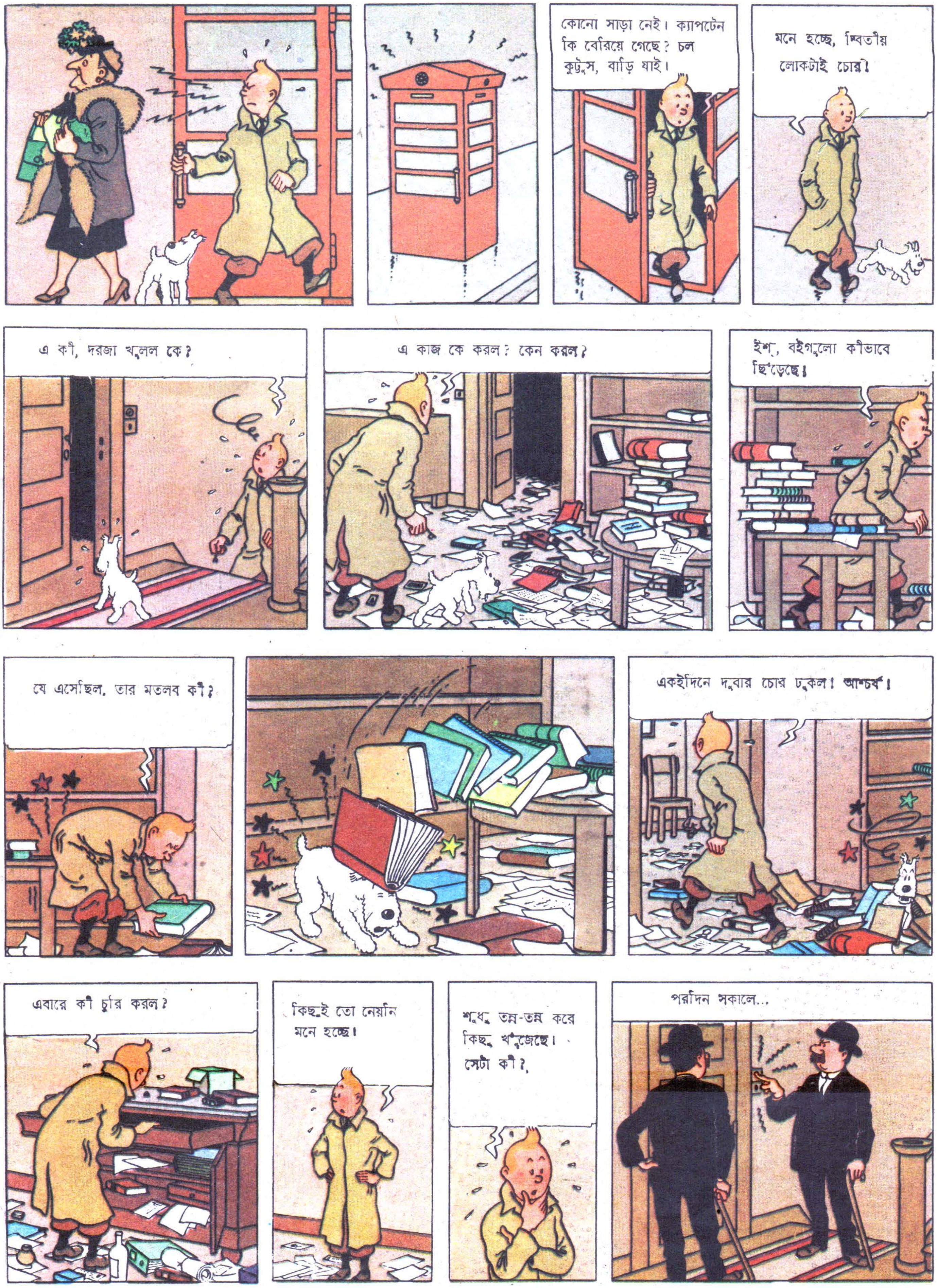

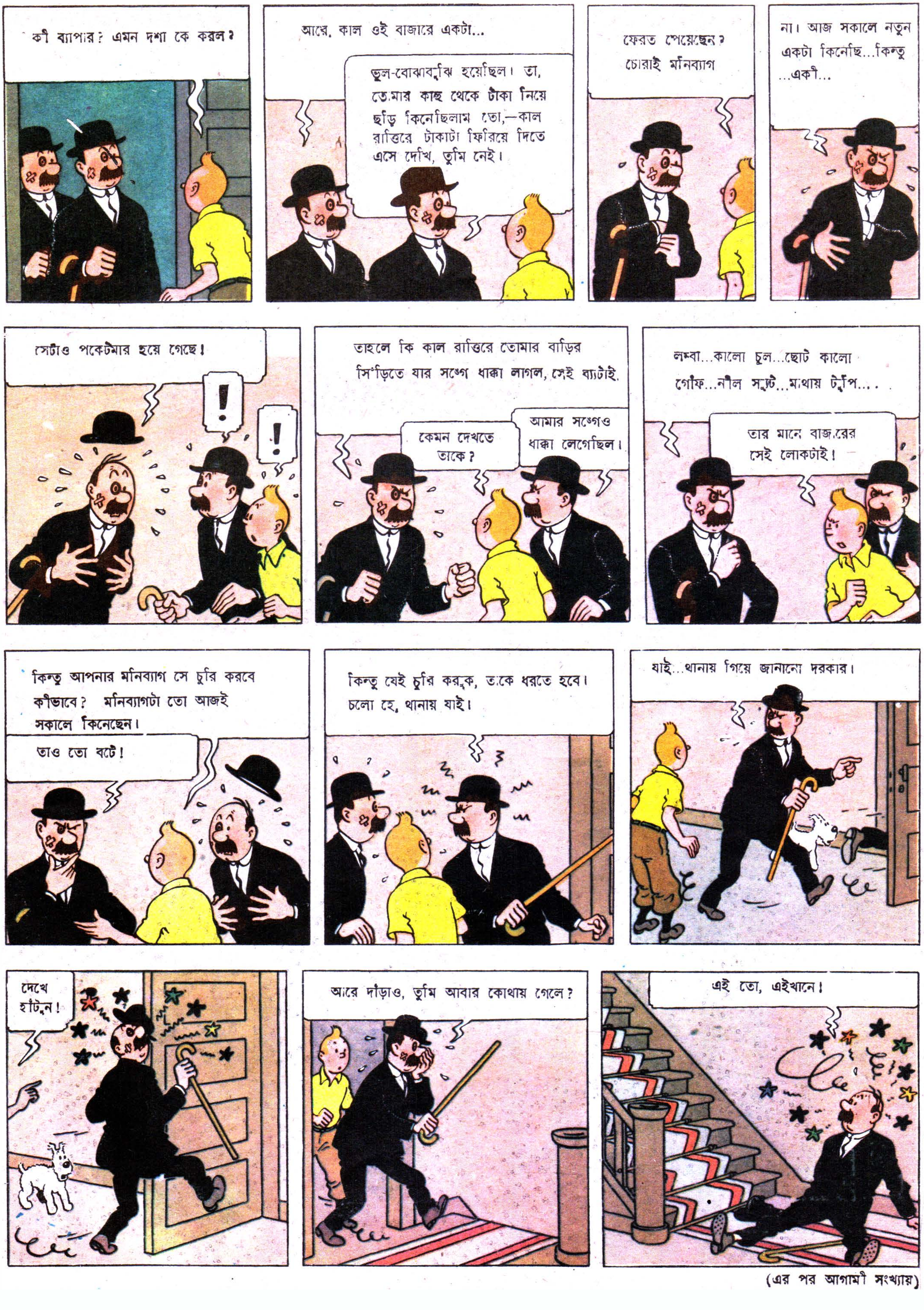

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

শেখো কারিগর

পেপার ম্যাসে বা মণ্ডনের কাজ

তোমরা জেনেছ কেমনভাবে মণ্ডন আর টুকরো কাগজ দিয়ে জিনিস তৈরি করতে হয়।

এবার জানো, কেমনভাবে রিলিফ ম্যাপ তৈরি করতে হয়, যা তোমার স্কুলের প্রজেক্টের কাজে লাগবে। কেবল রিলিফ ম্যাপই নয়, ইচ্ছে করলে, অন্য সব প্রজেক্টের কাজও এমনভাবেই করতে পার, ঠিক যেমনটি প্রয়োজন মনে হবে।

জোগাড় করা জিনিসের সঙ্গে যোগ করো একটি ভালো প্রাকৃতিক ম্যাপ আর প্লাই বা কোন শক্ত বোর্ড। শুরু করো—

তোমার নেওয়া বোর্ডের ওপর যে দেশের রিলিফ করতে চাও তার ছক এঁকে ফেলে তার সারা গায়ে, ভালমত আঠা লাগিয়ে নাও। তোমার তৈরী মণ্ডন বা পাল্প নিয়ে মাটির কাজের মত ধীরে ধীরে এক স্তর মণ্ডন সারা বোর্ডে ম্যাপ অনুযায়ী চাপিয়ে নাও। এবার সামনে ধরা প্রাকৃতিক ম্যাপ দেখে উঁচু নিচুর কাজ শুরু করো। কাজের সময় কোথাও বেশী নরম মনে হলে শুকোবার সময় দেবে। একটা কথা মনে রাখবে,—যদি তোমার কাজের বোর্ডের মাপ ২′×৪′-এর মধ্যে হয় তাহলে সমতল স্তর থেকে সব চেয়ে উঁচু জায়গার তফাত ৩″—৪″-র বেশী না হয়। কাজের মধ্যে নদ, নদী প্রকৃতির সব কিছু যথাযথভাবে দেখাবার চেষ্টা করবে। কাজ-শেষে ভাল করে শুকিয়ে গেলে শিরীষ দিয়ে মেজে পরিষ্কার করে একবার ভারনিস লাগিয়ে নাও। ভারনিস শুকোলে সাদা রং দিয়ে কাজ শেষ করো। ইচ্ছে থাকলে রঙিন ম্যাপের মত তোমার রিলিফ-কেও নানান রঙে রঙিন করে তুলতে পারো।

পরের বার জানতে পারবে কেমনভাবে একই কাজের অনেক-গুলি নমুনা পাওয়া যায়।

জেনে রাখো—যে দেশের রিলিফ করবে, তার একটি ভালো প্রাকৃতিক ম্যাপ সামনে রাখবে সব সময়।

মণ্ডনের কাজের সুবিধে, খুব সহজেই যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়। হালকা কিনা, তাই।

আঁকো রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

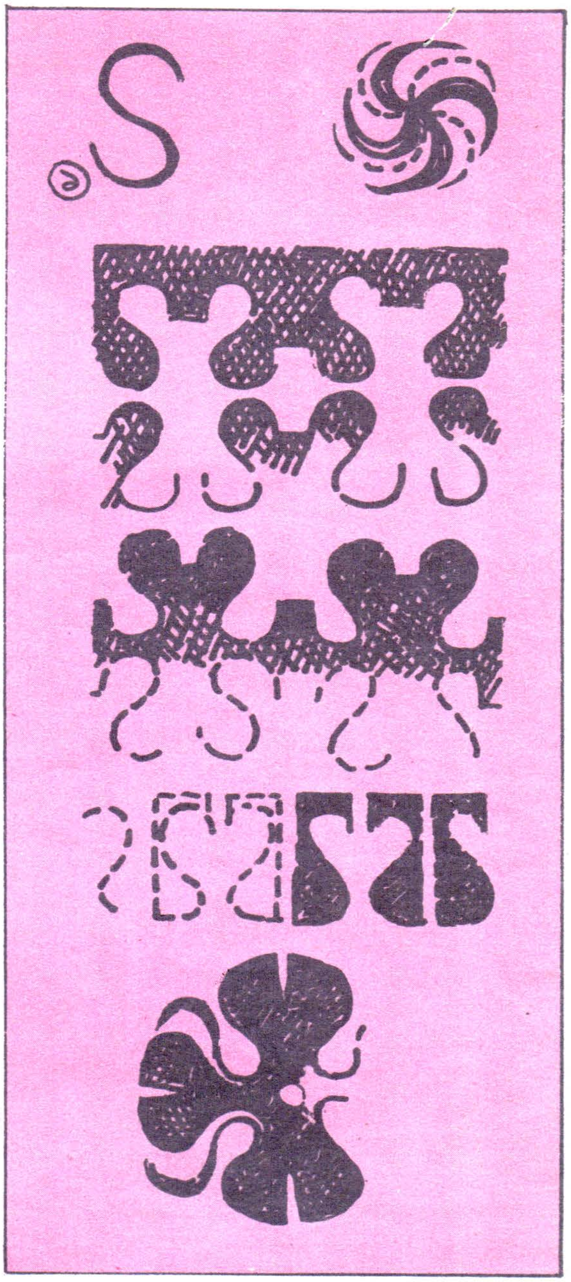

প্রত্যেকবার কয়েকটা আকার দিয়ে নকশা করার নানান ভাবনার কথা জেনেছ, ভেবেছ আর তা করেছ। এবার একটি আকার দিয়ে একই ভাবে ভাবা যেতে পারে। একটু চিন্তা করে মাথা ঘামালেই একই আকার, বহুতে মিলে একটা অন্য জগতের মধ্যে নিয়ে তোমায় হাজির করবে। কয়েকটা এঁকে দেখালাম কেবলমাত্র তোমাদের চিন্তাকে পথ করে দেবার জন্যে। সেই পথের ওপর দিয়ে হৈ হৈ করে এগিয়ে চলে যাও। তারপর নিজেরাই নানা পথ করে নাও। দেখবে, কিচ্ছু অসুবিধে হচ্ছে না।

তা দেবার বিপদ

লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকল টুম্পি, তার হাতে 'আনন্দমেলা'। বলল ঃ ওঃ, কাকু, কী-যে গণ্ডগোল করো তুমি! বললে একরকম, লিখলে একরকম।

সে আবার কী রে!

এই দেখো, এটা কী লিখেছ?

কোন্‌টা?

এই যে, হস্তিমূর্খ! হস্তীটা হস্তি হল কেমন করে আবার? এটা তো সংস্কৃত শব্দ? তাই তো শেখালে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, শেখালাম তো তাই! কিন্তু শেখবার কি আর শেষ আছে! ঠিকই বলেছিস তুই, কত-যে গণ্ডগোল!

'ভুল হয়েছে ভুল হয়েছে, কাকুর ভুল হয়েছে' বলে লাফাতে থাকে টুম্পি, আর আমি হস্তিমূর্খের মতোই গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকি ঃ এবার তাহলে করা কী? আর কি এগোনো ঠিক হবে? মাথায় সব জট পাকিয়ে যাবে না তো?

একটু পরে ডাক দিয়ে বলি, শোন্ টুম্পি, এখানে একটু বোস্ তো চুপ করে। হস্তী শব্দটা হল কেমন করে, মনে আছে তোর?

মনে নেই? হস্ত আছে যার, হস্ত আর ইন্—এই হল হস্তিন্—তার থেকে হস্তী।

আচ্ছা, ওই-যে হস্তিন্ বললি, সেটায় তো আছে হ্রস্ব ই? তাই না?

তাই তো। যেমন পক্ষিন্, গুণিন্, ধনিন্। তাই তো বললে তুমি।

বলেছি তো। ঠিকই বলেছিস তুই। এখন দেখ্, এই শব্দগুলি যদি আলাদা থাকে, একা থাকে, তাহলে এদের চেহারা হয়ে দাঁড়ায় পক্ষী, গুণী, ধনী বা হস্তী। তার মানে দীর্ঘ ঈ-কার। কিন্তু যদি অন্য কিছু জুড়ে দিস এদের সঙ্গে, মানে অন্য কিছু যদি জাপ্‌টে ধরে এদের, তাহলে কী হবে? তাহলে ওই আদি হ্রস্ব ই-কারটাই চলে আসে। এই হচ্ছে মজা। সেই জন্যেই হস্তী হল একরকম, হস্তিমূর্খ আরেকরকম। আকাশের চাঁদকে বলে শশী, তাই না?

আরো কত কিছু বলে।

তা তো বলেই। কিন্তু শশীও তো বলে? আর সেই শশী যার অলংকার, সেই মহাদেবের একটা নাম কী জানিস? শশিভূষণ। শশিশেখর। দেখলি, ঈ-কার এবার উড়ে গেল?

সঙ্গে আরেকটা শব্দ জুড়লেই এ-রকম হয় বুঝি?

কেবল শব্দ কেন? যে-কোনো একটা টুকরো জুড়লেই এ-রকম হয়। মনে আছে প্রত্যয়? সেই-যে তা তব্য অনীয়?

খুব, খুব।

আচ্ছা, তাহলে আগে প্রতিযোগী বানান কী বল্।

শেষটায় তো? দীর্ঘ ঈ-কার।

কিন্তু যেই বললি প্রতিযোগিতা, অমনি এল হ্রস্ব ই। আরো দেখবি? বিরোধী, কিন্তু বিরোধিতা। তেজস্বী, কিন্তু তেজস্বিতা। দ্রুতগামী, কিন্তু দ্রুতগামিতা। বুঝতে পারছিস?

খুব পারছি। তা তা তা।

দরজার কোণে বসে ঘুড়ি বানাচ্ছিল নন্তু। এতক্ষণে তার স্বর শোনা গেল ঃ বাইরে বৃষ্টিতে থৈ থৈ, আর ঘরের মধ্যে কাকুদের তা তা। এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

যাক, এতক্ষণে তবু দাদার গলা পাওয়া গেল।

হ্যাঁ, এইবার আমার মৌনতা ভাঙল।

কী বললি নন্তু? মৌনতা ভাঙল? এই হচ্ছে তা-তা করবার বিপদ। পাখি ডিমে তা দেয়, কারো কিছু বলবার নেই। রামু দারোয়ান গোঁফে তা দেয়, কারো কিছু বলবার নেই। কিন্তু তাই বলে তুই মৌনতেও তা দিবি?

নন্তু একটু ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলল, হয় না বুঝি?

আজ্ঞে না। তা কোথায় দেয় জানিস? বিশেষণ থেকে বিশেষ্য করতে হলে একটা তা জুড়ে দেয়। মৌন তো নিজেই বিশেষ্য, তার থেকে বিশেষণ তো হল মৌনী। মনে নেই হরিদ্বারের সেই মৌনী বাবা?

নন্তুও এবার মৌনী হয়ে রইল।

জিজ্ঞেস করি ঃ তোর সঙ্গে না ও-বাড়ির তপনের খুব বন্ধুত্ব?

উত্তর দিল টুম্পি ঃ একেবারে গলায় গলায়।

সখা শব্দ দিয়ে এই কথাটা বলতে পারিস নন্তু?

নন্তু একটু ভেবে বলল, তপনের সঙ্গে আমার খুব সখ্যতা।

ওই! তা দেবার বিপদ! সখা থেকে সখ্য হয় রে বাঁদর। তা আসছে কোথা থেকে? সখ্যতা নয়, সখ্য। সৌজন্যতা নয়, সৌজন্য। আর প্রায় সকলেই যে-ভুলটা করবার জন্যে মুখিয়ে থাকে, সেইটে বলি? উৎকর্ষতা নয়, উৎকর্ষ। বুঝেছিস? অপকর্ষতা নয়, অপকর্ষ। বুঝেছিস?

এখন বুঝেছি। কিন্তু কদিন মনে রাখতে পারব, বলা শক্ত। আমার বুদ্ধির তো তেমন উৎকর্ষ নেই!

কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধিতে তুমি যে উৎকৃষ্ট, সেটা মানতে হবে!

মাসটা আশ্বিন

দিদিমণি

পুজোর দিন এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে পুজোর ছুটি। স্কুলের ছুটির পর বিকেলে অনেকেই মা বাবা আর ভাইবোনেদের সঙ্গে দোকানে যাচ্ছে নতুন জামা জুতো কিনতে। অনেকে দর্জির দোকানে মাপ দিচ্ছে—কী প্যাটার্নের শার্ট প্যান্ট বা ফ্রক হবে তাই নিয়ে মায়ের সঙ্গে অনেক সময় মতের মিলও হচ্ছে না। জামা কাপড় শাড়ির দোকানে ভিড় উপচে পড়ছে, ভিড়ের ধাক্কায় ফুটপাথে হাঁটাও মুশকিল। পরের দিন স্কুলে গিয়ে গল্পও করছ কী কী নতুন জামাকাপড় হল তাই নিয়ে। অনেকে আবার পুজোর ছুটিতে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবে—তারই আনন্দে মশগুল। এদিকে ঝলমলে পূজা সংখ্যাগুলোও এখন একে একে বাজারে বার হতে থাকবে। তোমরা নিশ্চয় ভাবছ, পুজো-সংখ্যা আনন্দমেলা কবে বার হবে? তাই না? মোট কথা, সকলের মনেই এখন আনন্দ, মুখে একটা খুশী-খুশী ভাব।

এই খুশি শুধু তো মনের মধ্যেই আটকে নেই—যেন ছড়িয়ে পড়েছে সারা প্রকৃতিতে। চারিদিক সবুজে সবুজ। যাদের বাড়িতে বাগানে শিউলি গাছ আছে, তারা সকাল হলেই শিউলি ফুল কুড়োতে যাও। শিশিরভেজা ঘাসের ওপর যেন সাদা আলপনা আঁকা থাকে। কী সুন্দর মিষ্টি গন্ধ। অন্যান্য ফুলেদের মধ্যে আছে দোপাটি, জিনিয়া, টগর, জবা আর অপরাজিতা। রাত্তিরে হাসনুহানা ফুলের গন্ধ সারা বাগান মাতিয়ে রাখে। বর্ষার বৃষ্টিতে ধোওয়া আকাশ কী গভীর নীল। মাঝে মাঝে সাদা মেঘের টুকরো। রোদ্দুরের রঙ কাঁচা সোনার মতো হলুদ। গরমের দাপট কমে গেছে।

রাত্তিরে নির্মেঘ আকাশে তারারা ঝকমক করে। আকাশের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে ছায়াপথ। উত্তর পশ্চিম আকাশে সপ্তর্ষির ক্রতু ও পুলহ নক্ষত্র আর দেখা যায় না—তেমনই পশ্চিম আকাশ থেকে প্রায় অদৃশ্য হতে চলেছে কন্যা রাশি। নতুন তারাদের মধ্যে পূর্ব আকাশে দেখা দিয়েছে মীন রাশি আর মেষ রাশি। মেষ রাশির অশ্বিনী নক্ষত্রের নাম অনুযায়ী এই মাসের নাম হয়েছে আশ্বিন।

আশ্বিন মাসে এই যে দুর্গাপুজো হয়, এর আরেকটা নাম অকালবোধন। রামচন্দ্র রাবণকে বধ করবার জন্যে এই সময়ে দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। রাবণকে বধ করতে পেরেছিলেন বলেই এই মাসের দশমী তিথিকে বিজয়া দশমী বলা হয়। এই দিন অবাঙালীরা বিরাট বড় কাগজের রাবণ তৈরী করে তার মধ্যে নানা রকম আতসবাজি ভরে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। মূর্তিটি পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজিগুলোও ফাটতে থাকে দুমদুম করে। পুজোর কদিন প্যান্ডেলে-প্যান্ডেলে ঘুরে প্রতিমা দেখার ধুম পড়ে যায়। কত নতুন ধরনের মূর্তি, কত আলো, কত লোক—মনে হয় যেন একটা বিরাট মেলা বসে গেছে। বিজয়ার প্রতিমা নিরঞ্জনের দিন সকলেরই মন খারাপ হয়ে যায়। তারপর আছে বড়দের প্রণাম করা আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিষ্টিমুখ করা।

বড়দের কথা

ইন্দ্রমিত্র

দ্বারকানাথ ঠাকুর সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর কোম্পানির হাউসের এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সর্বেসর্বা।

প্যাটেল সাহেব তখন সদর বোর্ডের প্রধান মেম্বার। কী কারণে কে জানে, প্যাটেল সাহেবের সঙ্গে তখন দ্বারকানাথের বনিবনাও নেই।

সদর বোর্ডের সেরেস্তাদার তখন রামলোচন ঘোষ।

ঢাকা বিভাগের বরদাখাত পরগনা লাটে উঠল। মস্ত পরগনা বরদাখাত, খুব দামী সম্পত্তি। লাটে তো উঠল, এখন বরদাখাত পরগনা নিলাম হবে কোথায়? ঢাকায় নিলাম হলে খুব বেশী টাকায় বিক্রী হওয়ার আশা কম। কিন্তু যদি কলকাতায় বোর্ডের কাছারিতে নিলাম হয়, কলকাতায় অনেক পয়সাওয়ালা মানুষ আছেন, নিশ্চয়ই বরদাখাত পরগনার উপযুক্ত দাম পাওয়া যাবে।

অতএব প্যাটেল সাহেব সাব্যস্ত করলেন, কলকাতায় বোর্ডের কাছারিতেই বরদাখাত পরগনা নিলাম হবে।

কিন্তু সাধারণত এমন হওয়ার কথা নয়। যে-জেলার জমিজায়গা, সেই জেলাতেই নিলাম হওয়া দস্তুর। চলতি নিয়মে বরদাখাত নিলাম হচ্ছে না, খবর পেয়ে বরদাখাতের মালিকেরা ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, নিজেদের এলাকায় নিলাম হলে অল্প দামেই আবার বরদাখাত কিনে নিতে পারবেন তাঁরা। কলকাতায় যাতে বরদাখাতের নিলাম না হয়, সেই চেষ্টা করা দরকার। কলকাতায় চলে এলেন বরদাখাতের মালিকেরা। দেখা করলেন বোর্ডের সেরেস্তাদার রামলোচন ঘোষের সঙ্গে।

রামলোচন বললেন, আমার চেষ্টায় কিছু হওয়ার নয়। আপনারা বরং দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

বরদাখাতের মালিকদের নিয়ে রামলোচন দ্বারকানাথের কাছে এলেন। দ্বারকানাথ সব শুনলেন। রাজী হলেন।

পরদিন প্যাটেল সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হলেন দ্বারকানাথ। কথায় কথায় বরদাখাত পরগনার কথা তুললেন। প্যাটেল সাহেবকে বললেন, "আপনি এই জমিদারির নিলাম কলকাতায় হওয়ার জন্য যে-হুকুম দিয়েছেন তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমার নিজের বরদাখাত কিনবার ইচ্ছা আছে। জেলায় নিলাম হলে আমার সুবিধা হত না, এখানে নিলাম হলেই আমার ভাল, আমি নিজে এসে ডাকব, আমি ডাকলে বোধ হয় কলকাতায় আর-কেউ আমার উপরে ডাকবে না।"

প্যাটেল সাহেব দেখলেন, সর্বনাশ, শত্রুর উপকার করা হয়ে যাচ্ছে। শত্রুর উপকার হয় এমন কাজ কেউ করতে পারে না।

প্যাটেল সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, আমি ওইরকম হুকুম দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু বাকিদার মালিকেরা আমার কাছে দরখাস্ত করেছে, আমি তাই এখন মত বদলে ফেলেছি।"

প্যাটেল সাহেব সহাস্যমুখে, দ্বারকানাথকে বললেন, "না দ্বারকানাথ, আমি আপনাকে বরদাখাত জমিদারি কিনতে দেব না। বরদাখাত নিলাম ওই জেলাতেই হবে।"

গাব্‌লু

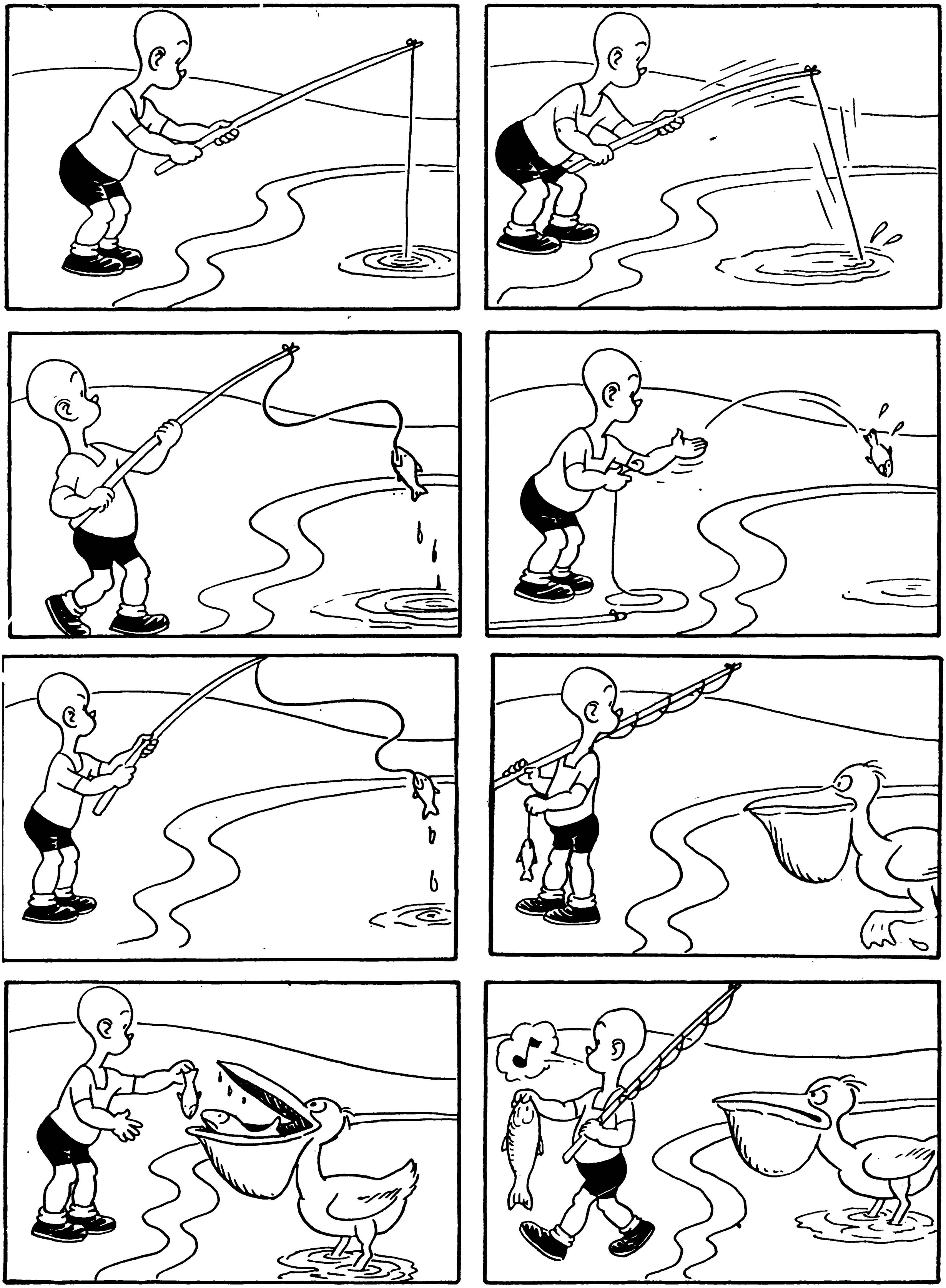

জয়, অনেক দিন পরে

স্ট্রাইকার

"তোরা কি আমার মৃত্যু চাস? আজ কি তোরা কিছুতেই *গোল করবি না?*" একজন কোচ এইভাবে তার প্লেয়ারদের কাছে করুণ আবেদন করছেন।

অবিশ্বাস্য! খেলোয়াড় যেন দেবতা। একজন কোচ এইরকম আবেদন কি কখনও রাখতে পারেন? অন্তত ফুটবল কোচ পি কে ব্যানার্জি পারেন। খেলাটা ছিল এবারের লীগে মোহন-বাগানের শেষ-খেলা। ওই শেষ ম্যাচে তাদের একটাই লক্ষ্য— জিততেই হবে, পাল ফোলানো নৌকোয় লীগ আমরা তুলবই। প্রতিপক্ষ এরিয়ান, অঘটনে মাস্টার টিম। এরিয়ান সে-ম্যাচের আগে পর্যন্ত অপরাজিত। এ-মরশুমে এরিয়ানই অমন টগবগে ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টারদের বুকের রক্ত হিম করে দিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম পরাজয় ঘটে যায় আর কি! হাফ টাইমের আগে সেই ভয় ওরা মোহনবাগানকেও দেখাতে ছাড়ল না। মোহনবাগানের স্টপার প্রদীপ চৌধুরী পায়ে চোট নিয়ে খেলতে চায়নি প্রথমে। পি কে ম্যাচের গুরুত্ব বোঝালে সে ঝুঁকি নেয়। হাফ-টাইমের আগে সে জীবনের সেরা ঝুঁকি নিল অম্লান *বদনে, অব্যর্থ গোল রুখে দিল। এরিয়ানের ওয়ান-আপ হওয়া* হল না। সে সময় পি কে-র মুখ শুকিয়ে আমসি। সমর্থকরা কংক্রিট গ্যালারিতে ধুলো হয়ে মিশে গেছে। ভাবনার চোটে অনেক কচি সমর্থককেও বুড়োটে লাগছিল। মাঝে-মাঝে তারা শুধু বিড়বিড় করছিল, খেলার আগে প্লেয়ারদের নিয়ে অত মাতামাতি না-করলেই হত। বিরতিতে পি কে খেলোয়াড়দের কাছে গিয়ে বললেন, "তোরা কি আমার মৃত্যু...।"

নিঃসন্দেহে প্লেয়ার পি কে গুণমানে আজকের মোহন-বাগানের প্লেয়ারদের কারও চেয়ে কমতি নন। প্রদীপের অটুট যুক্তি: "আমার আলাদা দায়িত্ব। এই কঠিন কথাগুলো দিয়ে আমি ওদের ছুঁতে চেয়েছিলাম। দেখলেন তো ম্যাজিকের ফল! হাফটাইমের পর মোহনবাগান টিম দারুণ দাপটে সারা মাঠ চষেছে, গোল করেছে।" অবশ্যই তারা ১৯৭৬ সালের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন।

খেলোয়াড় প্রদীপ নিজের খেলার সময়ও ওইভাবে মরিয়া হয়ে নিজের কাছেই জানতে চাইতেন—পি কে তুমি এ কী করছ? গোল করতে না-পারলে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাও। ফুটবলার হয়ে মাঠে নেমেছ কেন?

পি কে-র বিশ্বাস, ফুটবলারের খেলার কারুকার্যই একমাত্র হাতিয়ার নয়, জেতার জিদ চাই। মনোবল না থাকলে কোনও ফুটবলারই কিছু করতে পারে না। এই মনের জোরেই পি কে আজও ময়দানে অম্লান।

কতকগুলো ঠুনকো কথা হাওয়ায় ওড়ে—পি কে লাকি কোচ। ওর হাতের পলার আংটিটাই সব জয়ের পাশুপত। টেনিস খেলোয়াড় স্পেনের মানোয়েল সান্তানার মতো পি কে-রও প্রিয় পোশাক আছে—বালি রঙের সাদা শার্ট আর চকোলেট রঙের প্যান্ট।

এত সব বুজরুকির গল্প রয়েছে। কিন্তু কে বলবে আগের চার মরশুমে ইস্টবেঙ্গলে থাকার সময় পি কে আদৌ পরিশ্রম না করেই ভেল্কি দেখিয়েছে। অনস্বীকার্য, পি-কে মনের জোরের টনিক দিয়েও ইস্টবেঙ্গল টিমকে গৌরবে ঋজু রেখেছে। এবার টিম হিসাবে মোহনবাগান ময়দানের ফুটবল ময়দানবদের জড়ো করেছে। অনুশীলনে কোনও ঘাটতি ছিল না। গত ছ-

লীগ জয়ের সেই খেলা শুরু হবার আগেই মোহনবাগান-অধিনায়ককে মালা পরাতে যাচ্ছে এক সমর্থক

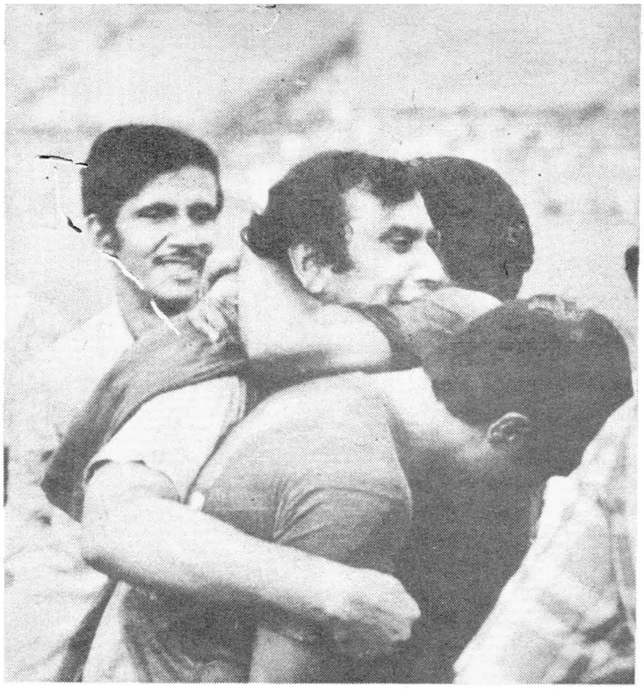

জেতার আনন্দে পি কে-কে জড়িয়ে ধরেছে দুই প্লেয়ার

বছরের ট্রফি না-পাওয়া টিমকে আবার হারার ভূতে যেন না পায়—পি কে-র সেদিকে ছিল কড়া নজর। এই ভয়টা কিন্তু প্রথম ম্যাচেই ঘটল। বাটার সঙ্গে ড্র।

এরিয়ান-ইস্টবেঙ্গল ড্র হতেই মোহনবাগান লীগের দৌড়ে ইস্টবেঙ্গলের কাঁধ ধরে ফেলে। টালিগঞ্জের সঙ্গে ড্র করার যুক্তি মোহনবাগান সমর্থকরা খুঁজে পায় না। ম্যাচের পরে মোহনবাগান তাঁবুর হাওয়া খুবই গরম ছিল। পি-কে টালিগঞ্জ ম্যাচের শেষে তাঁবুর বাইরে এসে সমর্থকদের কাছে খোলাখুলি বলেছেন, "আমি ও আমার টিম দোষী, আপনাদের মনের অবস্থা ভালভাবেই বুঝতে পারছি। আজ আমরা যে-কোনও শাস্তি নিতে রাজি আছি।"

মোহনবাগানের ইন্ডিয়ান ইলেভেনের ফরোয়ার্ড লাইনের ভয় বাটা প্রথম ম্যাচেই ভেঙে দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল টিমে বারবার প্লেয়ার বদলের ফলে খেলায় মোটেই দানা বাঁধেনি। বেশিরভাগ ম্যাচেই তারা গোলমুখে বারবার গিয়েও তিন-কাঠির ঘরটা যেন খুঁজে পাচ্ছিল না। ময়দানে একটা কথা চালু হয়ে গিয়েছিল, খেলা শুরুর দশ-পনের মিনিটের মধ্যে গোল করতে না-পারলে মোহনবাগানকে ঠান্ডা করে দেওয়া যায়। কথাটার কিছু মিল রয়েছে হাবিবের মতামতের সঙ্গে। সে তার ঘনিষ্ঠজনের কাছে প্রায়ই বলে, ম্যাচের শুরুতে অপোনেনটকে ঠেসে ধরে খান দুয়েক গোল চাপিয়ে দাও, ব্যস। তারপর টুকটাক ম্যাচ ধরে খেলে গেলেই জিত। খেলতে-খেলতে বল ধরেই হাবিব যেন বলে ওঠে—ভাই কোথায়? আকবর ইঙ্গিতে হাঁক দেয়—এই যে। প্রথম দিকে গোল না পাওয়ায় সুভাষের জার্সির উপর একটু অভিমান হয়েছিল। পি কে কিন্তু এসব ঝামেলা চুপচাপ মেরামত করে চলেছেন। হাবিব, সুভাষ, সুব্রত, মাঝে মাঝে ফুটবলারের মেজাজে দর্শকদের আকর্ষণ করেছেন।

দু টিম খেলার দাপটে উনিশ-বিশ। হাবিবকে আটকে দিলে মোহনবাগান ফরোয়ার্ডবাহিনী পিছিয়ে পড়ে। সেদিক থেকে তাল সামলেছে প্রসূন। প্রসূনকে টপকে ঢুকলে প্রদীপ ব্যাক লাইনে জার্নালের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডদের মধ্যে শ্যাম-সুরজিতকে বাধা দিলে গোটা ফরোয়ার্ড লাইন বোবা হয়ে যায়। গৌতম এখনও বিগ ম্যাচে অনবদ্য। পাশে প্রশান্ত ব্যানার্জি ছোট জায়গার মধ্যে খেলায় টেরর। ব্যাক শ্যামল ব্যানার্জি আগামী মরশুমে ছাড়পত্রের দিনগুলোয় আলোচনার খোরাক হবেই। গোলের গড়ে স্বাভাবিকভাবেই মোহনবাগান টিম ইস্টবেঙ্গলকে পিছনে ফেলেছে, কিন্তু দুই টিমই মহমেডানকে হারিয়ে সাজ-সাজ রবে প্রতীক্ষা করেছে—২৪ জুলাই ইডেনে কে জিতবে?

সেদিন নাকি প্রদীপ মোহনবাগান প্লেয়ারদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যিই ছল-ছল চোখ নিয়ে ওরা ইডেনে ঢুকেছিল। তার আগে পি-কে মোহনবাগান তাঁবুতে সারি-সারি অতীতের বিখ্যাত প্লেয়ারদের ছবির দিকে আঙুল তুলে বলেছিলেন—"আজ তোমাদের গুরু দায়িত্ব রয়েছে, ওই সব একদা-বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মাকে তৃপ্ত করতে হবে। কলকাতার ফুটবল এখন তোমাদের হাতে। স্মরণীয় খেলা খেলে আজ তোমরা চিরস্মরণীয় হও।" খেলোয়াড়রা জিতে ইডেনের

লীগ জয়ের গোলের পরে সুভাষ ভৌমিক

পালতোলা নৌকোর প্রতীক মাথায় সাংবাদিক-ছাউনির ছাতে এক মোহনবাগান সমর্থক

প্যাভিলিয়নে ফিরেও অঝোরে কাঁদছিল। সঙ্গে সঙ্গে দামাল পি কেও ডুকরে কেঁদে উঠেছেন।

দর্শকরা কিন্তু স্মরণীয় খেলা দেখতে পেল না। চোখের পাতা না-পড়তেই ১৫ সেকেন্ডে জ্যামিতির ছক-মাপা গোল। তারপর থেকে শেষের বাঁশি না-বাজা পর্যন্ত সারা স্টেডিয়ামে তেমন আর আবেগ ছিল না।

কলকাতার ৯৫ কিলোমিটার দূর থেকে তাতু বোস এসেছিল ইডেনে খেলা দেখতে। সে যথার্থই মোহনবাগান সাপোর্টার; মোহনবাগান গোলটি পাওয়ার পরে ভীষণ ডিফেন্সিভ হয়ে পড়ল। সে আর মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেনি। আমার পাশেই বসে ছিল দমদমের শংকর দত্ত। সারাক্ষণ সে কাঠ হয়ে সিঁটিয়ে বসে হাইকোর্টের চূড়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

সেদিন কিন্তু ইডেনে খেলা হয়েছে বললে ভুল হবে। আসলে খেলাটি হয়েছে ইডেন নামক ডোবায়। এমন কি খেলা শুরুর আগে রেফারি রত্নাঙ্কুর ঘোষ মাঠ পরীক্ষা করে সাফ জানান—এ মাঠে খেলা সম্ভব নয়। অগত্যা সব আয়োজন পণ্ড হবে, সেই খাতিরে খেলা হয়েছে।

খেলাও হল অদ্ভুত ধাঁচের। মাঠ ওরই মধ্যে ভাল থাকার অবস্থায় মোহনবাগান গোল হাঁকড়াল। একটু বাদে আর একটা চানস পেল উলগা। মিস্। গোল হলে খেলার ঝাঁজ আর থাকত না। আক্রমণের তোড়ে মোহনবাগান গোলের সামনে সারাক্ষণ ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডরা থরহরি লাগাল। ওই পর্যন্তই তাদের জারিজুরি শেষ। বিজয়ী দলের কোচ পি কে-র মতামত: "আমার দলের ফরোয়ার্ডদের খেলায় আমি আদৌ খুশি হইনি। মোহনবাগান ডিফেন্ডাররা যে পলকা নয় তা ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডরা আশা করি টের পেয়েছে।"

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক সত্য প্রসঙ্গ ধরা দিচ্ছে। অন্য ম্যাচের মত অপরের গোলের মুখে জটলার ফাঁকে ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডবাহিনী জড়িয়ে পড়েছিল। টসে জিতেও ইস্টবেঙ্গল টিম কেন মোহনবাগান ফরোয়ার্ডদের ইডেনের ভাল দিকটায় খেলার সুযোগ দিল? মোহনবাগানের দুই সাইডব্যাকই এতবড় ম্যাচের দিক থেকে নেহাতই আনকোরা অনভিজ্ঞ ছিল। ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডরা সে-সুযোগে মাঠের দুই ধার দিয়ে কেন অ্যাটাক হানল না? মোহনবাগান ডিফেনস হরবখত কপাট-আঁটা খেলা খেলল। কিন্তু তাদের সেই খেলা থেকে ফাঁক তৈরি করার জন্য কেন ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ার খেলার ধারা মন্থর করল না?

এই খেলাকে ইস্টবেঙ্গলের কোচ অমল দত্ত সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখেছেন। তাঁর বক্তব্য, "মোহনবাগানকে যতটা শক্তিশালী হিসাবে রটনা করা হয়েছিল, আসলে তারা ততটা শক্তিশালী নয়। আমাদের ছেলেরা ওদের চেয়ে ঢের ভাল খেলেছে। একবারও নতুন ট্যাকটিকস দেখলাম না মোহনবাগানের খেলায়।"

এতবার মোহনবাগান গোলে হুমড়ি খেয়ে পড়েও আপনার ফরোয়ার্ডরা কেন দেড়খানার বেশি গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারল না?

অমল দত্ত—"আমার ফরোয়ার্ডরা জানিয়েছে গোলে মারার সময় তাদের নন কিকিং ফুট (বল মারার সময় যে পা খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হয়) ঠিকমত মাটিতে রাখা যাচ্ছিল না। অন্য টুর্নামেন্টে মাঠ ভাল থাকলে আমার প্লেয়াররা ভাল খেলা দেখাবেই।"

এত কাণ্ড, কিন্তু লীগ জয়ের পরের দিন সকালে কাগজ দেখে পি কের কাছে মরশুমভর সমস্ত পরিশ্রমটাই অবান্তর ঠেকল। মারডেকায় ভারত ০-৮ গোলে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হেরেছে। অথচ কলকাতায় চারিদিকে তখন পটকা, তাসা, আবিরের ছড়াছড়ি। সেই মুহূর্তে জয়ের আনন্দ তাঁর কাছে বড় বিস্বাদ ঠেকেছিল। পি কে নিজেই স্বীকার করেন—মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নিয়ে ময়দানে মাথা ফাটাফাটি করে আমরা বৃথা সময় নষ্ট করি। উদ্দেশ্য যদিও ফুটবল খেলা, কিন্তু রেষারেষি চলেছে ঘটি-বাঙাল ঝগড়া নিয়ে। আজ যাঁরা ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার হিসাবে মাঠে ভিড় জমান, তাঁদের অধিকাংশেরই জন্ম কলকাতায়, অথবা পশ্চিমবঙ্গেরই কোনও জায়গায়। আবার অনেক ঘটি, পশ্চিমবঙ্গের লোকও ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাজার হাজার পরিবারে পশ্চিমবঙ্গের ছেলে অথবা মেয়ের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মেয়ে কিংবা ছেলের বিয়ে হয়েছে। অথচ ময়দানের ফুটবল নিয়ে খামোখা মাথা ফাটাফাটি চলেছে সমানে। এতে ময়দানের ফুটবলের মানও গোল্লায় যাচ্ছে, ঘরে ঘরে অশান্তিও বাড়ছে। যত তাড়াতাড়ি খেলাকে শুধু খেলাই ভাবতে পারি ততই মঙ্গল।

লীগ-জয়ের আগে-পরে

পুষ্পেন সরকার

সকাল সাতটায় নৈহাটির বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল টিকলু ও সন্দীপ। ক্লাস নাইনের ছাত্র ওরা। মোহনবাগানের খেলা এ-বছর একটাও দেখেনি। প্রিয় দলের লীগ বিজয় দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। সকাল সাড়ে আটটায় মাঠে টিকিটের লাইন দিয়েছিল। কিন্তু টিকিট-ঘর খোলার পর একদল বড় ছেলে এসে ওদের হটিয়ে দেয়। অনেক চেষ্টা করেও ওরা আর লাইনে দাঁড়াতে পারেনি। মাঠে ঢোকার পথে দেখলাম, একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দুজনেই কাঁদছে।

বাবার হাত ধরে এসেছিল দশ বছরের সুকোমল। খেলা দেখতে প্রথম মাঠে এল। কিন্তু মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা মাঠে নামতেই ও দেখিয়ে দিতে লাগল, ঐতো হাবিব কোণের দিকে দাঁড়িয়ে। আকবর শট নিল। প্রশান্ত মিত্র কী সুন্দরভাবে শট ধরল। নির্ভুলভাবে প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের নাম এইভাবে বলে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি তো আগে মোহনবাগানের কোন খেলা দেখনি, তাহলে কী করে খেলোয়াড়দের নাম বলে দিচ্ছ?" সুকোমল এক গাল হেসে বলল, "বাঃ, আমি খবরের কাগজে, বইতে ওদের কত ছবি দেখেছি। চিনতে ভুল করব কেন?"

একপাশে চারজন দর্শক। চারজনেরই বয়স ষাটের উপরে। এ বছর মোহনবাগানের প্রত্যেকটি খেলায় মাঠে এসেছেন, এবং সভ্য-আসনের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসে খেলা দেখেছেন। সেদিন মাঠে ঢুকে দেখেন, ওঁদের জায়গায় অন্য লোক বসে আছে। ওঁরা বললেন, "এ-বছর মোহনবাগানের প্রতিটি খেলা আমরা এই জায়গায় বসে দেখেছি। তোমরা ভাই আমাদের জায়গা ছেড়ে দাও।" যারা বসে ছিল, তারা চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা অনেক আগে এসে বসেছি, উঠব কেন?" বৃদ্ধদের মধ্যে একজন বললেন, "তোমরা যদি বসতে না দাও, তো আমাদের কিছু করার নেই। তবে এতগুলো খেলা জিতে এসে যদি শেষ খেলায় মোহনবাগান হারে, এবং লীগ না পায় তাহলে আমাদের দোষ দিতে পারবে না।" বাস্, যারা বসে ছিল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তারা জায়গা ছেড়ে দিল।

মোহনবাগান মাঠে সেদিন ক্লাবের পতাকা নিয়ে এসেছিল বহু দর্শক। গ্যালারির চারিদিকে ক্লাব-পতাকাগুলো বাতাসে পত্‌পত্ করে উড়ছিল। কান-ফাটানো পটকার আওয়াজ। মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা মাঠে নামতেই সবুজ আসনের বেশ কিছু লোক বেড়া টপকে মালা হাতে ছুটে এল। পুলিশ বাধা দেবার আগেই যে-খেলোয়াড়কে সামনে পেল, পরিয়ে দিল মালা। কেউ-কেউ খেলোয়াড়দের পায়ের উপর উপুড় হয়ে প্রণাম করে বলল, "লীগ আমাদের চাই।" দু-তিনজন মাঠের মধ্যে আমার কাছে এসে বসল। তাদের হাতে তখনও দশ-বারোটি করে গোড়ের মালা। জিজ্ঞেস করলাম, "এগুলো পরালে না?" জবাব দিল, "অর্ধেকটা পরিয়েছি, বাকীটা খেলার পরে পরাব।"

খেলা শুরু হবার বাঁশি বাজতেই কয়েকজন পুজার ফুল, বেলপাতা কপালে ছোঁয়ালেন। পকেট থেকে বার করে ঠাকুরের ছবিতেও প্রণাম করতে দেখলাম দু-চারজনকে। একজন মাটির ছোট একটা গণেশ ঠাকুর এনেছিলেন। গণেশকে মাঠে বসিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর গণেশের সামনে থেকে এক খাবলা মাঠের কাদা কপালে লেপে নিলেন।

মোহনবাগানের কোচ প্রদীপ ব্যানার্জীর কাছাকাছি বসে ছিলাম। মোহনবাগান-গোলের দিকে এরিয়ান বল নিয়ে গেলে প্রদীপ উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন। নিজের খেলোয়াড়দের খুব বকছিলেন। খেলা শেষ হবার বাঁশি বাজা পর্যন্ত প্রদীপ সেদিন বোধ হয় কম করে দুশোবার ওঠবোস করেছিলেন। প্রদীপের পিছনে গ্যালারিতে-বসা কয়েকজন তরুণ সভ্য প্রদীপকে বলছিলেন, "এখনও গোল হল না। গোল না হলে বুক ফেটে যাবে। আর সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই, প্রদীপদা।"

সেদিন খেলা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দে অনেকেই আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা নানা ভাবে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু মালায়, প্রণামে, আদরে, সোহাগে ওদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আবিরে লাল হয়ে গেল কতজনের মুখ। লাল ও সবুজ আবির ভাসতে থাকল বাতাসে।

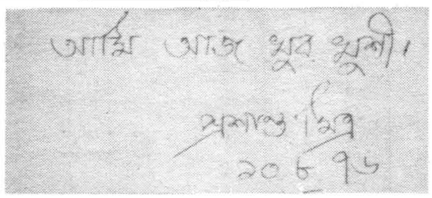

মোহনবাগানের অনেক খেলোয়াড়ের চোখে ছিল জল। কথা বলার শক্তি অনেকেই হারিয়ে ফেলেছিল। প্রদীপ মনের কথা বলতে গিয়ে আমার দুটো হাত ধরে নিজেকে সামলাতে বেশ কিছু সময় নিয়েছিল। তারপর বলেছিল, "আমি পেরেছি। অনেক কষ্টে, বহু পরিশ্রমে থামিয়ে দিয়েছি ছ বছরের সাফল্যের রথকে।"

অধিনায়ক প্রশান্ত মিত্র শান্ত স্বভাবের ছেলে। কম কথা বলে। প্রশান্তর চোখের কোণে দেখলাম ফোঁটা ফোঁটা জল। বলল, "আমি অধিনায়ক, ক্লাব লীগ পেল, প্রত্যেকটি খেলোয়াড় হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ লড়েছে। আমার নোটবুকে বড় বড় করে নিজের হাতে লিখে দিল "আমি আজ খুব খুশী"।

তাঁবুর দরজা বন্ধ। মোহনবাগান-লনে জনস্রোত। কয়েকটি ছেলে তাঁবুর দরজার কাছে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে। আমি পুলিসের সাহায্যে যখন তাঁবুর ভিতরে ঢুকছি, ওরা আমাকে বলল, "দাদা, আপনি প্রশান্তদাকে বলবেন, আগরপাড়া থেকে হরে আর নেপাল এসেছিল। প্রশান্তদা শুনলে খুশী হবেন। আর আমাদের ক্লাবের কথা একটু খেলিয়ে লিখবেন। কতদিন লীগ জয়ের কথা কাগজে পড়ি না।"

লালমুখো গ্রহ

সমরজিৎ কর

কোলাঘাটের নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়? রূপনারায়ণ নদীর ধারে সেই জায়গাটা, খড়গপুর যেতে গেলে যার ওপর দিয়ে যেতে হয়। এই কোলাঘাট থেকে নৌকোয় চড়ে রসুলপুর যাওয়ার পথেই দেখা হামিদ সাহেবের সংগে।

ছুটিতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে আমার মামার বাড়ি বেড়াতে চলেছি। নৌকোয় আরও লোকজন ছিল। পরিষ্কার আকাশ। আমরা গিয়ে বসলাম নৌকোর ছইয়ের ওপর। হামিদ সাহেবকে প্রথম দেখলাম সেখানে। পরিষ্কার একটি চাদর বিছিয়ে চিত হয়ে শুয়ে তিনি আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

মাঝি এসে কানে-কানে বলল, "খোকাবাবুরা, আপনারা ধীরেসুস্থে গল্প করবেন, গোলমাল হয় না যেন। তাহলে হামিদ সাহেব গোঁসা করবেন।"

মংগলের বুকে। বাঁ-পাশে চিহ্নিত পাথরের ওপর রোমান 'বি' হরফটি লক্ষ করো। কে ওই অক্ষরটি ওখানে লিখল? বিজ্ঞানীরা বলছেন, ওটা ছায়ার খেলা। তোমাদের কী মনে হয়?

"কে এই হামিদ সাহেব?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মাঝি বলল, "জানেন না বুঝি? ইনি মস্ত মানুষ। একশ পাঁচ বছর বয়েস। সেই ছেলেবেলায় দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন মিশরে। ফিরেছেন দু বছর হল। কী করতেন সেখানে, জানি না। তবে দেখেছি বাবু, নৌকোয় উঠলেই উনি এই ছইয়ের ওপর এসে চিত হয়ে শুয়ে শুধু আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন। তখন গোলমাল হলে রেগে যান বড়।"

মজার ব্যাপার তো!

যাই হোক, মাঝির কথা শুনে আমরা একটু রয়ে-বসে কথাবার্তা বলতে লাগলাম। আর এমনিভাবে রাত বাড়তে লাগল। সবার চোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে এল। শান্ত হয়ে এল নৌকোর পরিবেশ।

আমরাও ঢুলছিলাম হয়ত। রাত তখন কত, জানি না।

এমন সময় হঠাৎ হামিদ সাহেবের গলার শব্দে ঘুমের ঘোরটা কেটে গেল।

"আরে, এই তো সেই লালমুখো!" নৌকোয় চড়ার পর এই প্রথম তিনি কথা বললেন।

দেখি, তিনি চাদরের ওপর সোজা হয়ে বসে রয়েছেন। আর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে আকাশের কী যেন দেখাচ্ছেন কাউকে। সেই অন্ধকারে বুঝতে অসুবিধে হল না, তাঁর পাশে বসে রয়েছে সেই মাঝি। যে আমাদের সাবধান করে দিয়েছিল।

বলতে কী, ততক্ষণ আমাদের চোখ থেকে ঘুম পালিয়েছে। হামিদ সাহেবের তর্জনী-বরাবর আমরাও চাইলাম।

মাঝি আমাদের লক্ষ করে বলল, "এই যে খোকাবাবুরা, সাহেব কী মজার জিনিস দেখাচ্ছেন, দ্যাখো।"

"এই যে বাপ্, তোমরাও দ্যাখো। দেখার মত জিনিস বটে।" হামিদ সাহেব বললেন।

গোড়ায় কী ভড়কেই না দিয়েছিল মাঝিটা। তার কথা শুনে মনে হয়েছিল, সাহেব বুঝি খুব রাগী মানুষ। কিন্তু কথা শুনে তো মনে হচ্ছে খুবই ভালমানুষ তিনি।

"ওই যে, দেখছ না?" হামিদ সাহেব ততক্ষণ শুরু করে দিয়েছেন, "মাথার ওপর চিকমিক করছে কত তারা। ওদের মধ্যে কোনোটি আমাদের সূর্যের মত বড়। আবার কোনোটি এত বড় যে, তার মধ্যে আমাদের সূর্যের মত হাজার-হাজার সূর্য এক করলেও যত বড়টা হয়, তার চেয়েও বড়।"

"তাহলে ওই লালমুখোটা কী, সাহেব?" মাঝি প্রশ্ন করল।

"আরে সেই কথাই তো বলছি, বাপ।" হামিদ সাহেব বললেন, "আমাদের পৃথিবীর মত ওটাও একটা গ্রহ। সূর্যের নয় গ্রহের এক গ্রহ। ওর নাম মংগল। তারারা যেমন নিজেরা আলো দিতে পারে, গ্রহরা পারে না। সূর্যের আলো গ্রহের গায়ে গিয়ে পড়ে। পড়ার পর সেই আলো যখন আমাদের চোখে এসে হাজির হয়, আমরা তাকে দেখতে পাই। মজার ব্যাপার কী জানিস, এই সমস্ত গ্রহই সূর্যের চারপাশে পাক খেয়ে ঘুরছে।"

আমাদের এক বন্ধু বল্টু জিজ্ঞেস করল, "সূর্য থেকে মংগলগ্রহের দূরত্ব কত?"

"তা ধরো না কেন, পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় ন কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল। আর মংগলের দূরত্ব হল গিয়ে এই পনের কোটি মাইলের মত।"

মণ্টে হঠাৎ বলে উঠল, "মংগলগ্রহেও কি আমাদের মত মানুষ আছে?"

"এ তো বড় গোলমেলে কথা জিজ্ঞেস করলে তুমি। থাকলে ভালই হয়। খুশী হব আমরা। কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তা হলে, বাপ্, তোমাদের গোড়া থেকেই বলতে হয়। শোনো।"

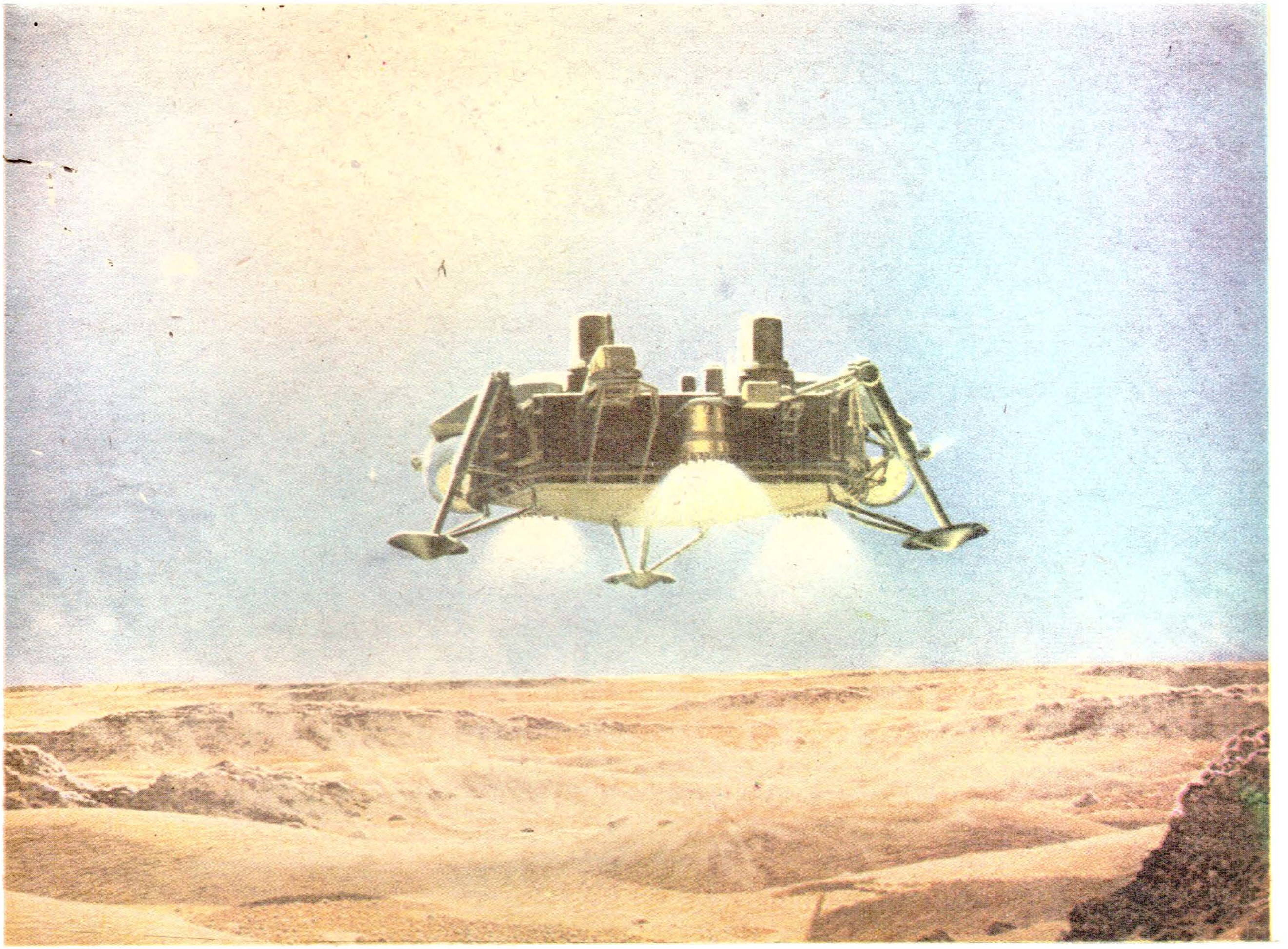

ভাইকিং-১ ল্যান্ডার কীভাবে মঙ্গলগ্রহে নামবে, শিল্পী তা আগেই এঁকে দেখিয়েছিলেন।

হামিদ সাহেব শুরু করলেন।

"আগে তো খালি চোখে কিছু বোঝা যেত না। তারপর দূরবীন আবিষ্কার হল। এই দূরবীন দিয়ে ১৮০০ সালের গোড়ায় জার্মানির স্রুটার নামে একজন বিজ্ঞানী মঙ্গলগ্রহকে অনেক পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলেন। তিনি তো অবাক। কালো কালো দাগ, সমুদ্রের মত জায়গা, উঁচু পাহাড়—সবই তো সেখানে রয়েছে! তাহলে কি সেখানে জল আছে? পৃথিবীর মত গাছপালা, পশু, মানুষ?

"সে এক তুলকালাম ব্যাপার। পৃথিবীর বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী সন্ধানের কাজে লেগে গেলেন। ১৮৭৭ সালে ইটালির মিলান শহর থেকে সিয়াপারেল্লি নামে একজন বিজ্ঞানী দূরবীন দিয়ে দেখে জানালেন, ওই গ্রহে তিনি বড় বড় খালের সন্ধান পেয়েছেন। বিরাট মরুভূমিও নাকি চোখে পড়েছে তাঁর।

"এ-কথা বললে কী হবে, এর পর আর সেগুলো দেখা গেল না। সবাই ভাবলেন, সিয়াপারেল্লির ওসব বাজে কথা। কিন্তু আবার দেখা গেল সেই খাল নয় বছর পর। দেখলেন একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নাম এস উইলিয়ামস। পি লাওয়েল নামে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী তো পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, খালগুলি দেখে মনে হচ্ছে, বেশ উঁচু জাতের মানুষ সেখানে বাস করে। বড় বড় বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার! তাদের বুদ্ধি পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক বেশী। ওরাই ওই সব খাল কেটেছে।

"তারপর থেকে কতভাবেই না মঙ্গলগ্রহ দেখার কাজ চলতে লাগল। দেখা গেল মঙ্গলের মেরুতে বরফের পাহাড় জমে রয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন বরফের টুপি। গরমের সময় সেই টুপি ছোট হয়,শীতে বাড়ে। এ থেকে কেউ কেউ ভাবলেন, গরমে নিশ্চয় সেখানে বরফ গলে বলেই ওই বরফ-টুপি ছোট হয়। শীতে জমে বলেই বড় হয়।

"একে-একে মঙ্গলের আকাশে মেঘও দেখা গেল। এক ধরনের মেঘ মঙ্গলের কাছাকাছি ভেসে বেড়ায়। যার রঙ হলদেটে কেউ কেউ বললেন, আসলে এরা মেঘ নয়। মঙ্গলের লাল এবং হলদে রঙের ধুলো। ঝড়ের তোড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর এক ধরনের মেঘ—দেখতে কতকটা আমাদেরই মত। তবে সে-মেঘ সম্ভবত জলের নয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড জমাট বেঁধে তৈরি।"

"তোমাদের কী বলব বাপু, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর তাবড় তাবড় মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, মঙ্গলে পৃথিবীর মত গাছপালা, পশুপাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে। উন্নত ধরনের সভ্যতা রয়েছে। বলতে কী, মার্কনি সাহেব গো—এই যিনি রেডিও আবিষ্কার করেছেন—একবার দেখলেন, তাঁর রেডিও-যন্ত্রে কেমন এক অজানা বেতার সংকেত ধরা পড়ছে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে তিনি তো তাজ্জব। বললেন, এসব মঙ্গলগ্রহের মানুষের কান্ড। ওরা রেডিও মারফত আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। পরে দেখা গেল ওটা ভুল।

"শেষ পর্যন্ত মানুষ হন্যে হয়ে লাগল। বিশেষ করে একএকটি মহাকাশযান আকাশে তোলার পর। একদিকে সোভিয়েত দেশ। আর একদিকে মার্কিন দেশ। সোভিয়েতরা পাঠালেন দুটি মহাকাশযান—মার্স-৩, মার্স-৪। এরা মঙ্গলগ্রহের অনেক কাছ থেকে নানান খবর পাঠাল। মার্স-৩ তো নেমেই পড়েছিল মঙ্গলের বুকে। কিন্তু নামার পর যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে যাওয়ায় তেমন বেশী-কিছু খবর পাঠাতে পারেনি। মার্কিন দেশ পাঠাল পরপর কয়েকটি যান। এদের নাম মেরিনার। এদের মধ্যে একটি হল মেরিনার-৯। এই মহাকাশযানটি মঙ্গলগ্রহের কাছে গিয়ে, আমাদের চাঁদ যেমন পৃথিবীর চারপাশে উপগ্রহের মত ঘুরছে,

বিজ্ঞান-বিচিত্রা পার্থসারথি চক্রবর্তী

তোতাপাখি

দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার ভারত-অভিযানে এসে এদেশে প্রথম তোতাপাখি দেখেন। এই পাখি দেখে আলেকজাণ্ডার এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি অনেকগুলো তোতা ভারতবর্ষ থেকে গ্রীস দেশে নিয়ে যান। তারপর থেকেই ভারতীয় তোতাপাখির নামকরণ করা হয়েছে 'আলেকজান্দ্রিন প্যারাকিট'।

তোতাপাখিরা বেশ বুদ্ধিমান, স্পর্শকাতর এবং মানুষের গলার হুবহু নকল করতে পারে। টিয়া, চন্দনা, কাকাতুয়া, শুকসারী ইত্যাদি পাখিরা তোতার দলে পড়ে। 'কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি, খেঁকশেয়ালী পালায় ছুটি'—এ কবিতা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। কাকাতুয়া দেখতে ধবধবে সাদা। কখনও কখনও কাকাতুয়ার গায়ে সাদার সঙ্গে হাল্‌কা গোলাপী অথবা হলুদ রং মেশানো থাকে।

তোতাপাখির মাথাটা বেশ বড়-সড়, বাঁকানো ঠোঁট এবং লম্বা লেজ আছে। প্রত্যেক পায়ে চারটে করে আঙুল, তার মধ্যে দুটো আঙুল আবার পিছনের দিকে বাঁকানো। এতে ওদের গাছের ডাল ধরতে খুব সুবিধা হয়।

কাকাতুয়ার নখের জোর এত বেশী যে, এরা অনায়াসে আমাদের একটা আঙুল আস্ত ছিনিয়ে নিতে পারে। কত রকমের তোতাপাখি আছে বলতে পারো? শুনলে অবাক হবে যে, প্রায় তিনশো ষোল রকমের তোতাপাখি আছে। এদের বেশির ভাগই অবশ্য গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বাস করে। এদের স্বভাবও অন্য আর পাঁচটা পাখির থেকে আলাদা।

এদের প্রিয় খাবার হচ্ছে বাদাম, ফল, বীজশস্য ইত্যাদি। এরা যত না ফল খায়, তার চাইতে ঢের বেশী নষ্ট করে। পাকা ফলের বাগান এবং শস্যক্ষেত্র এরা অনেক সময় উজাড় করে তবে ছাড়ে।

বুনো তোতাদের গলার স্বর বেশ কর্কশ। তবে এরা মানুষের গলার হুবহু নকল করতে ওস্তাদ। পৃথিবীর সব চেয়ে ভালো বলিয়ে-কইয়ে তোতাপাখির চেহারা হল ধূসর বর্ণের। এদের আফ্রিকায় ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যায়। এই শ্রেণীর পাখিরা বাচ্চা বয়সেই ভালো বলতে শেখে—কেউ কেউ আবার চমৎকার শিস্ দিতে পারে।

আমাদের দেশে কেবল ময়না, শালিক, শুক-সারী, টিয়া, তোতা, চন্দনা, কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখি কথা বলতে পারে। কিন্তু দলের মধ্যে থাকলে ওরা কেউই কথা বলতে শিখবে না। শেখাতে গেলে কেউ মুখ ভার করে থাকবে, কেউ বা ঠোকরাতে আসবে। সেজন্য পাখিটাকে একলা করতে হবে একটা খাঁচার মধ্যে রেখে। আদর করে পাখিকে খেতে দিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে যদি বলা যায়—খোকা কেমন আছ? সেও বলবে—খোকা কেমন আছ?

ঠিক সেইভাবে মঙ্গলের চারপাশে ঘুরতে থাকে। আর সেই সঙ্গে পাঠাতে থাকে নানান খবর।

"কিন্তু হলে কী হবে। এদিকে তো মাথায় হাত। এত কাণ্ড করার পরও শেষ পর্যন্ত ওই গ্রহটি সম্পর্কে যে-সব খবর পাওয়া গেল, সে-সব দেখে সবারই মন খারাপ। দেখা গেল, মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এত কম টানের ফলে সেখানকার বেশির ভাগ গ্যাসই মহাশূন্যে চলে গেছে। সেখানকার বাতাসে বেশির ভাগই কার্বন ডাইঅক্সাইড। আর্গন গ্যাস শতকরা তিরিশ ভাগ। অক্সিজেন নেই বললেই চলে। মঙ্গলের আকাশে মাঝে-মাঝে ওঠে ধুলোর ঝড়। যার গতি ঘণ্টায় একশ মাইলেরও বেশী। জল পাওয়া যায়নি বললেই চলে। আর আছে বড় বড় মৃত আগ্নেয়গিরি। কী বলব, একটা আগ্নেয়গিরি দেখা গেছে, যা প্রায় ২৪,০০০ মিটার উঁচু। নাম অলিম্পাস মনস। আমাদের মাউণ্ট এভারেস্টের থেকেতিনগুণ উঁচু এই পাহাড়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মঙ্গলের রঙ লাল কেন?"

"এ একটা ভাল প্রশ্ন। সূর্য থেকে দূরে বলে এমনিতেই সেখানে আলো পড়ে কম। তারপর আকাশে প্রচুর ধুলোমাটি ভেসে বেড়ায়। ফলে বেশির ভাগ আলো ওই ধুলোমাটির মেঘ শুষে নেয়। আমাদের চোখে ফেরত আসে কম আলো। যা আসে, তারও বেশির ভাগ লাল আলো। সূর্যের আলোর আর সব রঙিন আলো শোষিত হয় বলে লালটাই আমাদের চোখে পড়ে।"

বল্টু বলল, "তা হলে বলুন, সেখানকার বাতাস খুব হাল্কা?"

"হাল্কা মানে? সেখানকার বাতাসের চাপ কত, জান? পৃথিবীর বাতাসের চাপের দুশ ভাগের এক ভাগ।"

"তাহলে প্রাণের কী হবে?" মণ্টের প্রশ্ন।

"জানি না।" খানিকটা উদাস হলেন যেন হামিদ সাহেব। বললেন, "খবর পেয়েছ তো, মার্কিন দেশের একটি মাহাকাশযান ভাইকিং-১ নেমেছে মঙ্গলের উত্তর দিকে ক্রাইস নামে একটি জায়গায়। গত বছর আগস্টে এটিকে পাঠানো হয়। এর পরপরই পাঠানো হয়েছে আর একটি যান। নাম ভাইকিং-২। ভাইকিং-১ নেমেছে ২০ জুলাই, ১৯৭৬। এই যানটির দুটি অংশ। একটির নাম ভাইকিং-১ অরবিটার। এটি এখন উপগ্রহের মত মঙ্গলের চারপাশে ঘুরছে। অপরটির নাম ভাইকিং-১ ল্যাণ্ডার। এটি এখন মঙ্গলের বুকে দাঁড়িয়ে নানা রকম খবরাখবর পাঠাচ্ছে। অরবিটারও ওপর থেকে যা-সব দেখছে পৃথিবীতে তাদের বিবরণ পাঠিয়ে দিচ্ছে। তবে এ পর্যন্ত যা শোনা যাচ্ছে, ভাইকিং মঙ্গলের বুকে পৃথিবীর মত কোন গাছপালা দেখতে পায়নি। কোন জীব-জন্তুরও সন্ধান পায়নি। এখন কেউ-কেউ বলছেন, এক সময়ে এই গ্রহে হয়ত পৃথিবীর মত সভ্যতা বিরাজ করত। এখন তারা আর নেই। আর থাকবেই বা কী করে? বাতাসের সবটাই তো প্রায় কার্বন ডাইঅক্সাইড; না আছে অক্সিজেন তেমন কিছু, নাইট্রোজেন যা পাওয়া গেছে, তাও একটুমাত্র, শতকরা তিন ভাগ। জল নেই। উত্তর-দক্ষিণ মেরুর কথা বাদ দাও। ওই ক্রাইস, যেখানে ভাইকিং-১ নেমেছে, সেখানে গরমের দিনেই রাতের তাপমাত্রা শূন্যের চেয়ে ৮৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নীচে, আর দুপুরে এই তাপমাত্রা শূন্যের নীচে প্রায় ৩০ ডিগ্রি। এমন জায়গায় গাছপালা বা জীবজন্তু কী করে বাঁচবে, সে তো ভাবা যায় না।"

গল্প শুনতে-শুনতে আকাশ কখন পরিষ্কার হয়ে এসেছিল, জানি না।

মাঝি বলল, "হামিদ সাহেব যতবার এ নৌকোয় যান, একটা করে গল্প শুনি। তবে এবারকার গল্পের জবাব নেই। আমরা রসুলপুর এসে গেছি।"

তোমাদের পাতা

চিঠি চিঠি চিঠি

মাসিক আনন্দমেলা আমার প্রিয় পত্রিকা। টিনটিন ও টারজান পড়তে আমার এত ভাল লাগে যে, বারবার পড়ি। টিনটিনের গল্পে কুট্টুসকে আমার খুব ভাল লাগে। কুট্টুস আবার কথা বলে।

সুজাতা ভদ্র (বয়স ৯)

আমি ছোট মেয়ে একটি,
আনন্দমেলা পড়ি প্রতিটি।
একমাসটা বড্ড বেশি,
পনেরো দিনে হই খুশি।

বিনীতা রায় (বয়স ৯)

আমি মাসিক আনন্দমেলার একজন নিয়মিত পাঠক। আমাদের পাড়ায় আমার এক বন্ধু থাকে, সে বাংলা লিখতে বা পড়তে একদম পারে না, কারণ সে বাঙালী নয়, কিন্তু সে-ও আমার মত আনন্দমেলার ভক্ত। প্রত্যেক মাসে সে আমাদের বাড়িতে আনন্দমেলার গল্প, ছড়া ইত্যাদি শোনার জন্য আসে। আমি তাকে পড়ে শোনাই, সে খুব মন দিয়ে শোনে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "সবুজ দ্বীপের রাজা" খুব জমে উঠেছে। এই উপন্যাসটা পড়ার সময় নিজেকে "সন্তু" ভাবলে খুব মজা লাগে।

গৌতম কর

আমি মাসিক আনন্দমেলার গ্রাহক। আমার মনে হয় এই পত্রিকাটি প্রত্যেকেরই খুব পছন্দ। আনন্দমেলার সব লেখাই আমার খুব ভাল লাগে। পত্রিকাটিকে পাক্ষিকে রূপান্তরিত করলে খুব ভাল হয়।

সৈকত বিশু (বয়স ১৩)

বৃষ্টির দিনে

ভোরবেলা থেকে নামে ভীষণ বাদল
আকাশের দূত যেন বাজায় মাদল
চারিদিক থেমে আছে ছায়া ঘেরা দিন
জলে ভেজা প্রজাপতি রূপটি রঙীন
জানালার ধারে আমি বসে আছি একা
মাঝে মাঝে কালো মেঘ দিতেছে দেখা
মেঘ ও আকাশ আজ সঙ্গী আমার
বলছে আমায় যেন ডেকে বারবার
পরীর রাজ্যে তুমি চলো একবার
অনেক জিনিস আছে সেথা দেখিবার
যদি পারি একদিন সেথা যাব চলে
বাপি আর মা-মণিকে কিছু না বলে।

সুমন্ত বসু (বয়স ৮)

তিন ভাই

বৃষ্টি পড়ছে। মনে হচ্ছে, বৃষ্টি যেন সবাইকে সুখী করতে চায়। প্রখর রোদ্রের পরে প্রচুর বৃষ্টি সকলকে আনন্দিত করে। বৃষ্টিতে বৃক্ষ, প্রাণী, সবাই স্নিগ্ধ হয়। চাষীদের মুখ খুশিতে ঝলমল করে।

বৃষ্টিরা তিন ভাই। অতিবৃষ্টি হল সবার বড়, তারপরে বৃষ্টি এবং সর্বকনিষ্ঠ অনাবৃষ্টি। অতিবৃষ্টি আমাদের কারোর পক্ষে অনুকূল নয়। কেননা অতিবৃষ্টি হলে কৃষকের সাধের ফসল ধান এবং অন্যান্য শস্য নষ্ট হয়ে যায়। পাখিদের যেমন একটানা শীত ভাল লাগে না, তেমনি একটানা বর্ষাও।

অনাবৃষ্টিও একদম ভালো নয়। খাঁ খাঁ করছে ভীষণ রোদের বারুদে ঠাসা মাঠ-ঘাটবাট; কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার খবর নেই। অনাবৃষ্টি দেশে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে।

এই তিন ভায়ের মধ্যে মধ্যম ভ্রাতা সাধারণ বৃষ্টিই ভালো। সাধারণ বৃষ্টির কোনো বাড়াবাড়ি নেই। আমরা সাধারণ মানুষ, সাধারণকেই আমাদের ভালো লাগে।

দীপায়ন নন্দী (বয়স ১৪)

ঘুড়ি

আমার নাম ঘুড়ি
আকাশ পানে উড়ি,
পাখিরা আমার সঙ্গে
পাল্লা দেয় জুড়ি।

—**নীলাঞ্জন বসু** (বয়স ৭)

আয় ঘুম

আয় ঘুম যায় ঘুম
পি জি পাড়া দিয়ে,
হাসপাতালে রোগী কাঁদে
ইনজেকশন নিয়ে।

—**পার্থ চক্রবর্তী** (বয়স ৮)

বাবুই-বাসা

বাবুই পাখির বাসা
দেখতে ভারি খাসা,
ঘর বেঁধে বাস করবে বলে
মনে বড় আশা।

—**কৌশিক চট্টোপাধ্যায়** (বয়স ৮)

আমার কথা

আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ি। আমাদের বাড়ি রামরাজাতলায়। আমাদের বাড়িতে দুটো গরু, দুটো ছাগল, তিনটে মুর্গী আর একটা কুকুর আছে। কুকুরের নাম ধাঘা। এদের নিয়েই আমার কথা। বাবা বলেন, কথা মানেই গল্প। আমি ভাবি, কবে আমি বড় হব! বড় হলে আমি আনন্দমেলার সব গল্প নিজে পড়ে বুঝতে পারব। এখন আমার টিনটিন, রূপ-কথা ও ধাঁধা পড়তে ভাল লাগে।

কাবেরী ভাদুড়ী (বয়স ৫)

বুড়ো আঙুল

আমি কলা খেতে খুব ভালবাসি। এক দিন বাবা আমার আর ভাইয়ের জন্যে দুটো কলা আনলেন। আমি কলা খেতে ভাল-বাসি তো, তাই ভাইকে বুড়ো আঙুল খেতে দিয়ে আমি দুটো কলাই খেয়ে ফেললাম।

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৮)

বেড়াতে গিয়ে

বড়দিনের ছুটিতে আমি সেবার বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দুদিনের জন্য। মাসান-জোর, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর ও শান্তিনিকেতনে। সঙ্গে ছিল মা, বাবা আর বোন। বাস এসে থামল প্রথমে সিউড়ি শহরে। ছোট শহর। হোটেল ঠিক করা ছিল। খেলাম পেট ভরে। সিউড়ি থেকে অনেক মাংস আর ভাল চাল কিনে নেওয়া হল। রাত্রে তারাপীঠে রান্না করে খাওয়া হবে। সিউড়ি থেকে গেলাম মাসান-জোর। সেখানে কী সুন্দর পাহাড়। দুদিকে পাহাড়, মাঝখানে নদী। নদীর ওপরে বাঁধ। আমি বাঁধের ওপর দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, নীচে জল ছিটকে পড়ছে। তার পাশেই পার্ক। সুন্দর-সুন্দর ফুল ফুটে আছে। চা বিস্কুট খেলাম বাঁধে দাঁড়িয়ে।

সেখান থেকে গেলাম তারাপীঠে। তখন রাত আটটা বাজে। অন্ধকার। চারিদিক কেমন যেন চুপচাপ। গা ছমছম করতে লাগল। তারাপীঠে অনেক মাংস, ভাত রান্না হল। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে তারা মায়ের পুজো দিলাম।

বক্রেশ্বরে হট্ স্প্রিংয়ে স্নান করলাম, কিন্তু গা পুড়ে গেল না। আমার খুব ভাল লাগল। সবার শেষে এলাম শান্তিনিকেতনে। জায়গাটা কী সুন্দর! সুন্দর-সুন্দর বাড়িঘর, স্ট্যাচু, ছবি, বাগান দেখলাম। নানারকম ফুল, বাহারি গাছ পাতা দেখলাম। তখন ছিল পৌষ মেলা। আমি মেলা থেকে লাঠি, আংটি, কাজ-করা ব্যাগ কিনলাম। খুব ভাল লাগল মেলা। তারপরে বাসে চড়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।

করতোয়া আচার্য (বয়স ১০)

আনন্দমেলা। দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩৮৩। দেড় টাকা
ANANDAMELA Regd. No. WB|CC 264

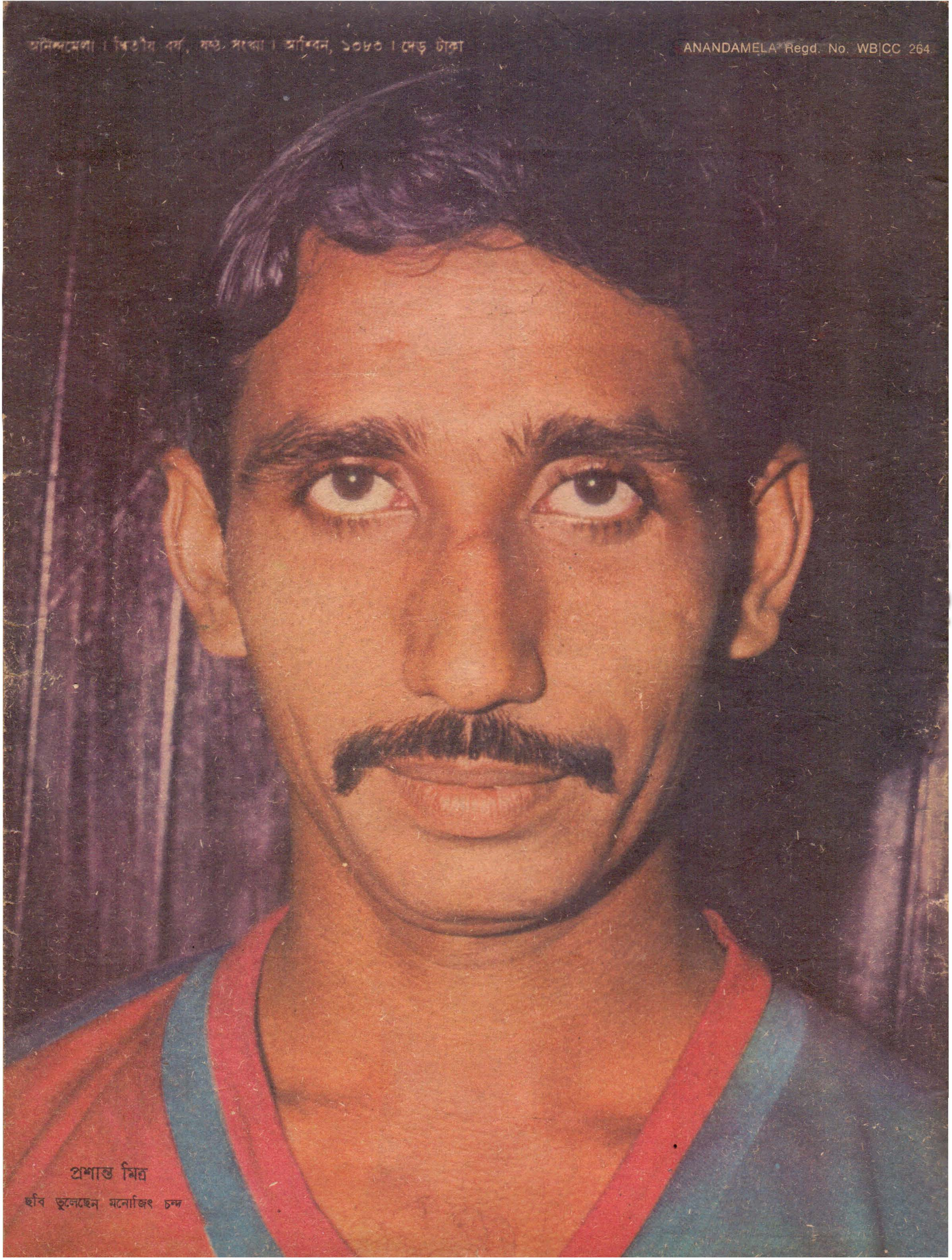

প্রশান্ত মিত্র
ছবি তুলেছেন মনোজিৎ চন্দ